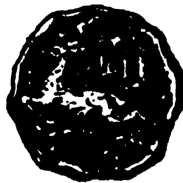
সপ্ত বদ্যির উপাখ্যান

সতুবদ্যির উপাখ্যান

সতু বদ্যি



নতুন সাহিত্য ভবন
কলিকাতা-২০

প্রকাশক

সুশীলকুমার সিংহ

নতুন সাহিত্য ভবন

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট

কলিকাতা-২০

মুদ্রাকর

শ্যামল দে

হিন্দ পেপার প্রিণ্টার্স

৭১।১, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদশিল্পী

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৩

দাম তিন টাকা চার আনা

—এই লেখকের আরেকটি বই—

সতু বস্থির রোজনামচা

সতু বক্সির ঠানদিদিকে

শৈশবে যিনি রামায়ণ মহাভারতে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান সতু বক্সিকে দিয়েছিলেন।

সতু বক্সির বাবাকে

বাল্যে যিনি সতু বক্সিকে প্রথম উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

আর মাকে।

এই পুস্তকে বর্ণিত কোন চরিত্রের সঙ্গে জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির যোগাযোগ নেই। যদি কোন ব্যক্তি কোন চরিত্রের মধ্যে তার ছায়া দেখতে পান তবে তা নেহাতই আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র।

গল্প আছে—এক ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত মলমূত্রে নোংরা হয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁকে পরিষ্কার করবার জন্যে এক মেথর ডাকা হল। মেথর বলল, ময়লা পরিষ্কার করা তার পেশা বটে কিন্তু মড়া পরিষ্কার করা তার কাজ নয়—সে কাজ মুদ্দোফরাশের। তখন ডাকা হল মুদ্দোফরাশকে। মুদ্দোফরাশ বলল, হ্যাঁ মড়া পরিষ্কার করা তার কাজ বটে কিন্তু ময়লা পরিষ্কার করা তার কাজ নয়। সে কাজ মেথরের। সুতরাং তার দ্বারাও ভদ্রলাকের গতি হবে না।

মহা মুশ্‌কিল। কী করা যায়। শেষ পর্যন্ত পাড়ার মাতব্বরের মাথার বুদ্ধি খেলল—একজন ডাক্তারকে ডাকা যাক।

তাই ডাকা হল। ডাক্তার এলেন—মড়াও পরিষ্কার করলেন, ময়লাও পরিষ্কার করলেন। মেথরেরও কাজ করলেন, মুদ্দোফরাশেরও কাজ করলেন।

এই হল একজন ডাক্তারের পেশা—তার জীবন।

পৃথিবীর যত ক্লেদ, যত ব্যাধি—যত দৈন্য তাই নিয়েই তার কাজ। তার ভাগ্যে লেখা—তার সমস্ত কর্ম-জীবন কাটবে এই কদর্য পরিবেশে—এই রোগ আর দারিদ্র্যের ভিতরে।

আর শুধু কি তাই? তার আর্থিক সাচ্ছল্য নির্ভর করবে একদিকে সমাজের আধি-ব্যাধির ওপরে আর অন্যদিকে বিপন্ন মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের সামর্থ্যের ওপরে।

এই জীবন নিয়ে ডাক্তার বাঁচে কি করে? তার তো অমানুষ হয়ে যাবার কথা—পিশাচ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু সবাই তো তা হয় না। কেন হয় না বলতে পারেন?

একবার গঙ্গাদেবী গিয়ে নারায়ণকে নালিশ করেছিলেন। পৃথিবীর যত পাপী সবাই গঙ্গাস্নান করে পাপমুক্ত হয়। কিন্তু সেই পাপীদের সংস্পর্শে এসে গঙ্গাদেবীর দেহে জ্বালা ধরে যায়—এর কি কোন উপায় নেই?

তার উত্তরে নারায়ণ গঙ্গাদেবীকে ভরসা দিয়েছিলেন—পাপীরা স্নান করে করুক। কিন্তু সাধু সন্তরাও গঙ্গাস্নান করেন। তাঁদের স্পর্শে গঙ্গাদেবীর উত্তপ্ত দেহ শীতল হবে।

সেই রকম বর বোধহয় সতু বদ্যিদের জাতভাইদের ওপরেও আছে। অন্তত সতু বদ্যির তাই মত।

আর সেই জন্যেই সতু বদ্যি যখন চোখ মেলে দেখে তখন কখনো হয়তো দেখতে পায় পাপীয়সী ভ্রষ্টা নারীর ভিতরে মহিমময়ী মাতৃমূর্তি, হয়তো পাগল

ভূটকোর ভিতরে দেখে দরিদ্র গ্রামবাসীদের ত্রাণকর্তা—হয়তো দেহ-ব্যবসায়ী চাষীর মেয়ের ভিতরে দেখে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী, আবার হয়তো রকের আড্ডাবাজ বকাটে ছেলের ভিতরে দেখে পরম পিতার প্রতিমূর্তি।

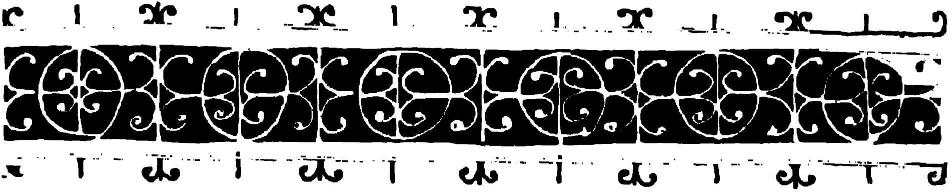
সেই অমৃতের স্পর্শেই নাকি সতু বক্সি এখনও বেঁচে আছে। আর আশা করছে আগামী যুগ যুগ ধরে সেই অমৃতই বাঁচিয়ে রাখবে সতু বক্সি আর তার বংশধরদের।

সতু বক্সি বলে সে নেহাতই জাত বক্সির বংশ বলে তার মনে হয়েছে এ অমৃতের সন্ধান হয়তো আর কেউ পায়নি। সতু বক্সিরা তো পুরুষানুক্রমে ক্লেদই ঘেঁটে এসেছে কিনা তাই। কিন্তু হয়তো এও হতে পারে যে, এ অমৃতের সন্ধান একচক্ষু হরিণের মত সতু বক্সির কাছে নতুন হলেও জনসাধারণের কাছে নতুন নয়।

তবুও সতু বক্সি এই অমৃতের সন্ধান সবাইকে দিয়ে রাখছে।

সবার যদি এ সন্ধান জানাও থাকে তাহলেও কোন ক্ষতি নেই।

কারণ অমৃতে তো অরুচি হয় না।



বিড়াল ও বনবিড়াল

আচ্ছা বলুন তো, এত সুন্দর বাড়ি আজকালকার দিনে ভাড়া পাওয়া কি সোজা কথা? লোকে বলে বাড়িই পায় না।

দোতলা বড় বাড়ি। একতলা, দোতলা, চিলে কোঠা সব মিলিয়ে দশখানা ঘর—কল, দুটো বাথরুম, দুটো রান্নাঘর, বারান্দা—একটু ছোট উঠোন সব আছে। এই কলকাতা শহরে লোকে থাকবার জায়গার অভাবে কত কষ্ট পায়। তবে হ্যাঁ, ভাড়াটা একটু বেশী।

তা বদ্যিগিন্নী সে বন্দোবস্তও করেছে। ভুটকো ডাক্তার আর তার গিন্নীকে দোতলার খানিকটা ভাড়া দিয়ে দিলে—মাসে অন্তত ১০০৲ টাকা করে দেবে। সুতরাং মাসিক আর দেড় শো টাকা সতু বদ্যি দিলে, বাড়িখানা ভোগ দখল করা যায়। কিন্তু তা কি হবার যো আছে? সতু বদ্যি দিলে সব ভণ্ডুল পাকিয়ে। সংসারের কোন কাজই সে করবে না, সকাল বেলা উঠে ডাক্তারখানায় যাবে আর রাত দুপুরে ফিরবে। সবই করতে হবে বদ্যিগিন্নীকে। কিন্তু ভণ্ডুল করবার বেলায় সতু বদ্যি ঠিক আছে।

সতু বদ্যি কিনা শোনামাত্র ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, না ওতে সে নেই। ভুটকোর সঙ্গে নাকি সে অনেক দিন থেকেছে। মেডিক্যাল কলেজে থাকতে নাকি সতু বদ্যি আর ভুটকো এক মেসে থাকত। সুতরাং ভুটকোকে হাড়ে হাড়ে চেনে। ও একটা কাঠগোঁয়ার। ওকে নিয়ে ছাত্রাবস্থায়, বিয়ে-থা না হলে, মেসে থাকলে থাকা যায়, কিন্তু এখন সতু বদ্যি একটা ডাক্তার—পাঁচজনে চেনে, মানে, খাতির করে, মান-সম্মান আছে, সেখানে ও-রকম একটা কাঠ-গোঁয়ারকে নিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

না—না, ভুটকো লোক খারাপ নয়, বরং ভালো লোক—খুব ভালো লোক—অত্যন্ত ভালো লোক—তবে কাঠগোঁয়ার। কখন যে কি করবে তার ঠিক নেই। আর ও কোথাও থাকতে পারে না। সতু বদ্যিদের মেসে কেন এসেছিল—আগের মেস থেকে?

ও, বঙ্কিগিন্নী তা জানে না বুঝি ?

আগের মেসের বাড়িওয়ালার সঙ্গে মেসের ছেলেদের ঝগড়া চলছিল অনেকদিন ধরে। বাড়িওয়ালা চাইছিল মেস উঠিয়ে দিয়ে বাড়ি খালি করতে আর মেসের ছেলেরা তাতে রাজী হচ্ছিল না—এই নিয়েই ঝগড়া।

একদিন হয়েছে কি বাড়িওয়ালার কর্মচারী একটা উচ্ছেদের নির্দেশ নিয়ে ভোরবেলা এসেছে তিনতলায় মেসের ম্যানেজারকে দিতে, ডাক্তারী ছাত্ররা কে কখন বাড়ি থাকে তার তো ঠিক নেই তাইতে কারও দরকার থাকলে ভোরবেলাই দেখা করতে আসে। তখন ছিল শীতকাল। সে মাসে যে ছেলেটি ম্যানেজার ছিল সে একটু গোবেচারী ভালো মানুষ গোছের ছেলে।

তাকে কর্মচারী নোটিশটা দিয়েছে, ছেলেটিও কর্মচারীকে বুঝিয়েছে অনর্থক ঝগড়া করে লাভ কি? কর্মচারীও বলেছে, সে আর কি করতে পারে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—সে তো সামান্য কর্মচারী মাত্র।

কর্মচারীটি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, ভূটকো একপাশে উবু হয়ে বসে এতক্ষণ একমনে দাঁতন করছিল। হঠাৎ ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল—'হ্যাঁরে, শালা কেন এসেছিল?'

'উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে গেল।' ম্যানেজার নিস্পৃহভাবে জবাব দেয়।

'আর তুই ওকে অমনি অমনি ছেড়ে দিলি? আর কী মিষ্টি কথা! তা চুমু খেতে বাকি রাখলি কেন বাবা? ছোট্ট করে একটা চুমু খেয়ে দিলেও তো পারতিস।' ভূটকো ভীষণ রেগে যায়।

এর ভিতরে কর্মচারীটি একতলার সিঁড়ি থেকে মাঝখানে উঠোনের দিকে যাচ্ছে। তাই না দেখে ভূটকো 'ওরে শালা হারামজাদারে' বলে চেঁচিয়েই পাশ থেকে এক ড্রাম বাসী জল ওর মাথায় ঢেলে দিয়েছে।

সে লোক তো ঘাবড়ে গিয়ে কোনরকমে হকচকিয়ে দৌড়ে পালাল। কিন্তু গিয়ে নালিশ করল বাড়িওয়ালাকে, তারপর তাই নিয়ে ফৌজদারী মকর্দমা, সে আর শেষ হয় না।

ছেলেরা আপস করতে চায় কিন্তু বাড়িওয়ালা ভূটকোকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে কিছুতেই আপস করবে না।

শেষ পর্যন্ত ভূটকো মেস ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আর তারপর এসে সতু বঙ্কিদের মেসে আশ্রয় নেয়।

'ও হল ওই রকম।'

'তা দশ বছর আগে বাড়িওয়ালার সঙ্গে গোলমাল করেছে বলে আজও তাকে অর্ধেক বাড়ি ভাড়া দেয়া যাবে না এ কি রকম যুক্তি ?' ভুটকোর গল্প উপভোগ করতে করতে বস্তিগিন্নী প্রশ্ন করে।

না, না, সতু বস্তি তা বলছে না। ও আসলে খারাপ লোক তা-ই ও বলছে না। আসলে ও লোকটা একটু যুক্তিহীন।

বস্তিগিন্নীর মত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাহীন লোকদের-এ সব কথা বোঝানো বড় মুশকিল। অনেক চেষ্টা করে সতু বস্তি বোঝাতে শুরু করে। বিবর্তনের পথে মানুষ এক রকম জন্তু হওয়া সত্ত্বেও জন্তু থেকে আলাদা হয়েছে কেন ? তার কারণ হচ্ছে মানুষ হল যুক্তিবাদী জন্তু। আর যুক্তির মূলে আছে মস্তিষ্কের উচ্চতম স্তর। যাকে ইংরেজিতে বলে কর্টেক্স। এই উচ্চতম স্তর থেকে সব যোগসূত্র এসেছে মধ্যস্তরে। মস্তিষ্কের এই মধ্যস্তরই উচ্চতম জন্তুদের মস্তিষ্কের উচ্চতম স্তর। এই মধ্যস্তরকে যদি উচ্চতর স্তর তার যোগসূত্র দিয়ে সব সময় নিয়ন্ত্রণ না করে তা হলে মানুষ তার জন্তুসুলভ বৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়বে। আর তাহলে সে যে কখন রাগবে আর কখন ভালবাসবে, কখন মারধোর করবে আর কখন চুমু খাবে তা বলা একেবারেই অসম্ভব। ভুটকোর হল আসলে ওই নিয়ন্ত্রণ যোগসূত্রের সামান্য অভাব।

তাছাড়া সেই ঘটনার কোন মানে হয় ?

তখন ওরা ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। বন্ধু জিতুর বোনের বিয়ে। ভুটকো খেতে বসেছে, আর সবাইও একসঙ্গে খেতে বসেছে। ভুটকোর খাওয়া অমানুষিক। কুড়িটা ফ্রাই খেয়েছে। চোদ্দটা চপ খেয়েছে। আঠারো হাতা মাংস খেয়েছে। বত্রিশ টুকরো মাছ খেয়েছে। টক খেয়েছে, দই খেয়েছে। চারদিকে একটা ছোটখাট ভিড় জমে উঠেছে। ঠিক এই সময় ট্র্যাজেডি।

ভুটকো দেখে দই-এর পরও সার দিয়ে আসছে—রাবড়ি, রসগোল্লা, পান্তুয়া, দরবেশ, সন্দেশ, বরফি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভুটকোর পেটে তখন তিল রাখবার স্থান নেই। আর এদিকে গজু, জিতু সবাই তাতাচ্ছে : কিরে ভুটকো রাবড়ি ক-হাতা ? সন্দেশ ক-গণ্ডা ? ভুটকো যত করুণভাবে বলে পেটে স্থান নেই—ওরা তত ভুটকোকে দেখিয়ে গপা-গপ মিষ্টি খায়—আর বলে 'আচ্ছা সন্দেশ না খেলি আর দুটো মাছই অন্তত খা।'

ভুটকো কি করল জানো ? হঠাৎ হেঁড়ে গলায় বাড়ি মাতিয়ে ভেউ ভেউ করে

কেঁদে উঠলো। আবার ভুটকোর সামনে ভিড জমে গেল। মায় মেয়ের বাবা অর্থাৎ জিতুর বাবা পর্যন্ত হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন—

'কী হয়েছে? বিয়ে বাড়িতে কান্না কিসের?'

'সন্দেশ-রাবড়ি-রসগোল্লা'—ভুটকো রীতিমত ফোঁপাতে থাকে।

'তা কি হয়েছে? তোমাকে দেয়নি?' জিতুর বাবা লজ্জিত হয়ে ওঠেন।

'না, তা নয়' ভুটকো আরো জোরে ফোঁপাতে থাকে। 'পেটে জায়গা নেই তাইতে ফেলে যেতে হবে।'

জিতুর বাবা কি আর করেন? শেষ পর্যন্ত ভুটকোকে একটা রিক্সায় চাপিয়ে দু-হাঁড়ি মিষ্টি হাতে দিয়ে কোনরকমে বিদায় করলেন। বিয়ে বাড়িতে কান্নাকাটি আর কি করে সহ্য করা যায়?

ভুটকো ড্যাং ড্যাং করে মিষ্টি নিয়ে বাড়ি চলল।

আমাদের এদিকে লজ্জায় মাথা কাটা যায় কিন্তু ভুটকো দিব্যি তিন দিন ধরে ওই মিষ্টি সাঁটাল।

'আচ্ছা বল? এরকম লোক নিয়ে কেউ বসবাস করতে পারে?'

বন্থিগিন্নী কিন্তু তাও বুঝতে চায় না। মানে ভুটকো না হয় খেয়ালীই আছে। কিন্তু তা বলে তাদের কি? সে থাকবে তার ভাগে আর বন্থিগিন্নী থাকবে তার ভাগে। এত ভালো বাড়ি তো আর তা বলে ছেড়ে দেযা যায় না।

'আর তারপর ফৌজদারী মামলায় জেলে গেলে?'

'আমাকে কচি খুকী ভাবো নাকি? ফৌজদারী মামলা আবার আসবে কোথেকে?' বন্থিগিন্নী উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'শোন তবে'—

সংতু বন্থি আবার শুরু করে।

আমাদের মেসটায় ছিল তিনটে ঘর। অনেকদিনকার পুরনো বাড়ি, রেলিঙের গরাদগুলো লোহার কিন্তু জানলার গরাদগুলো কাঠের। ভুটকোর একদিন কি খেয়াল হল। বাড়িওয়ালা ভাড়া নিতে এসেছে তাকে তাড়া করে বসল।

'হ্যাঁ মশাই? জানলার এই কাঠের গরাদ কেটে যদি চোর সব চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে কি হবে? ওগুলো পালটে লোহার গরাদ করা যায় না?'

'যাবে না আর কেন?' বাড়িওয়ালা একটু বিরক্ত হয়েই বলে 'তবে আপনাদেরই বা কি এমন সম্পত্তি আছে যে চোরে গরাদ ভাঙতে যাবে? আছে তো দেড়খানা ছেঁড়া বই। ওতে কি আর চোরের মজুরি পোষাবে?'

বাড়িওয়ালা তো রাগ করতেই পারে, মেসের বাড়িভাড়া নেবার সময় তো কাঠের গরাদ দেখেই নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ভুটকোর তাতে ভয়ংকর অপমান হল, হতে পারে তার সম্পত্তি মোটে দেড়খানা বই কিন্তু বাড়িওয়ালা তা বলবার কে?

সুতরাং ও কি করল জানো? সব জানলার গরাদগুলো ভেঙে ভেঙে চেলা কাঠ করে উনুনে জ্বালিয়ে দিল। আর শুধু কি তাই? দোতলার বারান্দার রেলিঙের লোহার গরাদগুলো পর্যন্ত টেনে টেনে খুলে একপাশে রেখে দিল। বিক্রি করে সন্দেশ খাবে।

বাড়িওয়ালা একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখে তার জানলার গরাদ সব ফাঁক। সে হন্তদন্ত হয়ে তখুনি ছুটে এসেছে।

সেদিন ছিল আবার রবিবার। দুপুরবেলা ভুটকো খালি গায়ে হাঁটুর ওপর লুঙ্গি গুটিয়ে উবু হয়ে মেঝেয় বসে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে। ভুটকোর চেহারা তো জানো। খালি গায়ে রীতিমত একটা দুশমন।

বাড়িওয়ালাও এসে ধরবি তো ধর ভুটকোকেই। তারপর ভুটকো আর বাড়িওয়ালার ভিতর অনেকটা এইরকম কথা হল:

বাড়িওয়ালা—'হ্যাঁ মশাই আমার জানলার গরাদগুলো কি হল?'

ভুটকো—'বসুন, বসুন।'

বাড়িওয়ালা—'কিন্তু গরাদ কি হল?'

ভুটকো—'তা বলছি, কিন্তু আপনি কেন বলেননি বলুন তো আগে! এইরকম ব্যাপার, মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে আগে থেকে বলা অন্তত উচিত ছিল আপনার।'

পাল্টা চাপে বাড়িওয়ালা একটু ঘাবড়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে—'কি আবার বলব মশাই?'

'কেন? আপনার বাড়িতে যে এই রকম সর্বনেশে ব্যাপার আছে তা তো অন্তত বলা উচিত ছিল। দুটো টাকা ভাড়ার জন্যে মশাই আপনারা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন?'

বাড়িওয়ালা এবার সত্যিই ঘাবড়ে যায়। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে 'কি হয়েছে বলুন তো?'

'উঃ মশাই উঃ' ভুটকো এবার গুছিয়ে বলতে শুরু করে, 'দিনের বেলা, দুপুর বেলা মশাই। আমরা সবাই এখানে জেগে বসে। আর আমাদের চোখের

সামনে একদল রাক্ষুসে উই আপনার ওই গরাদের কাঠগুলো কক্ কক্ করে খেয়ে ফেলল মশাই। এ কি উই ? এ তো মশাই বাঘের চাইতেও ভয়ানক। ভাগ্যে আমরা জেগে ছিলুম নইলে হয়তো আমাদেরই খেয়ে ফেলত। যে উই শুকনো কাঠ ওইভাবে কপাকপ খেয়ে ফেলতে পারে সে উইয়ের কাছে আমাদের মত তুলতুলে মানুষের মাংস তো মশাই রসগোল্লা…'

ভুটকোর দীর্ঘ অভিযোগ শেষ হয়।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা মেরে দাঁড়িয়ে থাকেন। উইয়ের খবরে ভয় পেয়ে ভ্যাবাচাকা নয়, ভ্যাবাচাকা ভুটকোর আশ্চর্য আস্পর্ধায়।

খানিকক্ষণ বাদে ভদ্রলোক বলেন, 'আমাকে কি কচি খোকা পেয়েছেন মশাই যে আপনার ওই আজগুবী গল্প আমি বিশ্বাস করব ?'

'ও, বিশ্বাস করবেন না ? তা বেশ না করলেন', বলে ভুটকো হাত বাড়িয়ে হকি স্টিকটা হাতে নেয়, তারপর পাশের ঘর থেকে ডাকতে থাকে আমাদের 'ওরে তোরা সব আয় একবার। শালা বিশ্বেস করছে না। ওকে একবার বিশ্বেস করিয়ে দিতে হবে।'

বিশ্বাস করানোর আগেই বাড়িওয়ালা ভুটকোর মত ওই দুশমনের হাতে হকি স্টিক দেখে মানে মানে সরে পড়ল। কিন্তু সেও মহা ঝানু লোক। তারপর শুরু করল এক ফৌজদারী মকর্দমা আমাদের সবাইকে আসামী দাঁড় করিয়ে। আমরা নাকি সবাই মিলে ওকে মারধোর করেছি।

আচ্ছা বল, একটা ফৌজদারী মকর্দমা—আমরা সবাই আসামী। একটা উকিলও লাগানো হয়েছে। আমরা যে মারিনি তা প্রমাণ করার সব বন্দোবস্ত হয়েছে। যাই হোক, সব হবু ডাক্তার—একটা ফৌজদারী মোকর্দমার দাগী আসামী হয়ে থাকবার কোন মানেই হয় না।

কিন্তু ভুটকোকে যেই হাকিম জিজ্ঞাসা করল—'তুমি ওকে মেরেছ ?'

ভুটকো অমনি কবুল করে বসল—'হ্যাঁ মেরেছি।'

ব্যাস্! আমাদের সব আইন-উকিল গোল্লায় গেল—সবার এক টাকা করে জরিমানা হয়ে গেল। তাহলে বুঝতে পারছ, অপরাধ করল ভুটকো আর আমরা সবাই সারা জন্মের মত হয়ে রইলাম দাগী দাঙ্গাবাজ।

আর শুধু কি তাই ? জরিমানা দিয়ে আমরা সবে কোর্ট থেকে বেরিয়েছি—কোর্টের দরজায়ই বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা। বাড়িওয়ালা আমাদের দেখে

বেশ বিজয়ীর মত হেসে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিল। ভুটকো হঠাৎ বলে উঠলো, 'শালা—এক টাকা দিলেই তোকে ঠ্যাঙানো যায়? তা হলে এই নে এবার দু-টাকা দেব।' বলেই আমরা বাধা দেওয়ার আগেই বাড়িওয়ালার পিছন দিকে একটা লাথি।

আবার একটা ফৌজদারী মকর্দমার ভয়ে শেষে আমরা পালিয়ে বাঁচি।

এই হল ভুটকো। আর তুমি তার সঙ্গে থাকতে চাইছ। ও যে কখন কি করে বসবে তা বলা স্বয়ং ভগবানেরও অসাধ্য।

সতু বদ্যি তার গল্প শেষ করে।

গল্প করতে করতে রাতও ক্রমশ গভীর হয়ে আসে। আর হাসতে হাসতে বদ্যিগিন্নীর ঝাঁঝও কমে আসে। তাছাড়া সত্যিই হাসি পায় ভাবতে। সেই ভুটকো, সেই সতু বদ্যি এখন ডাক্তার হয়েছে। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক হয়েছে। ভাবতেও কী রকম লাগে।

মেসের সেই এককালের চপল দুষ্টু ছেলে সতু বদ্যি এখন তার স্বামী। ভাবতেও বদ্যিগিন্নীর হাসি পায়।

'আসলে ভুটকো চিরকাল জব্দ করে এসেছে—নিজে কখনও জব্দ হয়নি কিনা—তাইতে তোমাদের ভুটকোর ওপর রাগ।' বদ্যিগিন্নী রায় দেয়।

সতু বদ্যি রেগে যায়—'জব্দ কি আর হয়নি? ওই ভুটকোকে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে দেখিনি আমি। একবার হলেও দেখেছি।'

বদ্যিগিন্নীর কৌতুহলের শেষ নেই! 'কি করে জব্দ হল বলই না।'

অগত্যা সতু বদ্যি আবার গল্প শুরু করে:

তখন তো বদ্যিগিন্নী ছোট, মনে নেই বোধ হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর মনে আছে কি বদ্যিগিন্নীর? না ভুলে গিয়েছে?

বদ্যিগিন্নী প্রতিবাদ করে। না সে ভোলেনি। তার মনে আছে। রাস্তায় রাস্তায় লোকে ফ্যান চাইত। আর নোংরা হয়ে মরে পড়ে থাকত।

হ্যাঁ, মন্বন্তরের বছর। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় যখন সব মানুষ না খেয়ে মরা শুরু করল তখন থেকেই কী রকম ক্ষেপাটে হয়ে গেল ভুটকো। একে তো ও পাগলাটে চিরকালই। তার ওপরে ও যা দেখে তাই ওর মনে রেখাপাত করে গভীর ভাবে। সেই কয়েক মাসই ও পাগলের মত ছুটোছুটি করেছে। আহার নিদ্রাই প্রায় ছিল না—আর কলেজ তো চুলোয় গেছে।

যাই হোক কলকাতার রাস্তায় মানুষ মরা প্রায় বন্ধ হয়ে এল। অগ্রহায়ণ মাসের

মাঝামাঝি। ভূটকোও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আবার কলেজ যাওয়াও শুরু করেছে। আর তাছাড়া ভলির সময় এসে গিয়েছে। ভূটকোর ভলির সময় মানে বছরের কোন সময় হিসাবে নয়। ভলির সময় মানে ভূটকোর ক্ষেত্রে ভালো মেজাজের সময়। ভলি ভূটকো প্রায় সারা বছরই খেলত। আর তাতে ভূটকোও খুশি থাকত আর ওর বন্ধু-বান্ধবরাও নিশ্চিন্ত থাকত।

ভলি খেলার সময় ভূটকোকে দেখলে যে-কোন লোকই ভাবত ভলি খেলাই বোধহয় ওর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর, আর শুধু কি তাই? বাড়ি এসেও ঘণ্টা ছয়েক ধরে চলত ভলিরই আলোচনা। সুতরাং ভূটকো থাকত ভারি খুশি।

ভূটকোর বন্ধু-বান্ধবরাও নিশ্চিন্ত থাকত। যাক্ বাবা! মারপিট যা-সব যদি ভলির বলের ওপর দিয়েই যায় তাহলে অনেকটা ভরসা। অন্তত বাড়িওয়ালা কি তার নায়েবকে মারপিট করে ফৌজদারী তো করবে না।

ভূটকোর টিম সেদিন ভলিতে কি একটা ম্যাচে জিতেছে। সন্ধ্যাবেলা ভূটকো মেসে এসে আমাদের বিশদভাবে বোঝাচ্ছে। ওর চাপ-মারে বিপক্ষ কিরকম বে-কায়দা হয়েছে আর বিপক্ষের চাপ ও কি রকম অবলীলাক্রমে উঠিয়ে দিয়েছে।

এর ভিতরে দুই ছাত্র-নেতা এসে হাজির। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়েন। সারা কলকাতার ছাত্র-সমাজের তাঁরা নাকি নেতৃস্থানীয় অন্তত তাঁদের ধারণা সেই রকমই।

ভূটকো কিংবা আমরা যে তাঁদের কথা না শুনতাম তা নয়। প্রধানতঃ তাঁরা হলেন পোস্ট-গ্রাজুয়েট আর আমরা হলুম আণ্ডার গ্রাজুয়েট। তাছাড়া তাঁরা এমন অনেক রকম কথাবার্তা বল্‌তেন যা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির অগম্য। তাঁরা বলতেন, যুদ্ধ আর শান্তি—বলতেন সাম্রাজ্যবাদ আর সাম্যবাদ—ক্ষুধার্ত জনতা আর পরাধীন দেশ।

সুতরাং নেতা বলে আমরা তাদের না মানলেও—তাদের যে ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রচুর করতাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সেই ছাত্র-নেতারা আমাদের কাছে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন।

তাঁরা বললেন, দুর্ভিক্ষের পর মহামারীর খবর। বললেন, দারিদ্র্যের সাথী মহামারীর খবর। সমস্ত বাংলা মহামারীর কবলে ধুঁকছে। কলেরা, বসন্ত,

ম্যালেরিয়া, আমাশা সমস্ত রোগ বাংলা দেশব্যাপী মহামারীর রূপ নিয়েছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার লোক আজ দেশে নেই।

সাধারণ লোকের দেহে রোগ প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা ছিল অনাহারে তা শেষ হয়েছে। সমাজের মারীবিরোধী সংগঠন ছিল দুর্ভিক্ষে তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। দেশে যাঁরা ডাক্তার ছিলেন তাদের বিরাট অংশ যুদ্ধে যোগদান করেছে। বিদেশ থেকে ওষুধ আসত যুদ্ধের দরুন তা বন্ধ হয়েছে। দেশে ওষুধ তৈরি হত কিন্তু তাও যুদ্ধের দরুন দুষ্প্রাপ্য আর দুর্মূল্য হয়েছে।

আর তাইতেই সুলভ হয়েছে মারী আর মৃত্যু।

আমাদের ছাত্র-নেতারা আরও উদাত্ত স্বরে আমাদের আহ্বান করলেন, আজ যখন দেশের নেতারা জেলে—ডাক্তাররা যুদ্ধে—তখন গ্রামে মেডিক্যাল ছাত্ররা যদি যোগদান না করে তাহলে কে করবে? হতে পারে তারা স্বল্পবিদ্যা, হতে পারে তাদের ক্ষমতা সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য ক্ষমতা নিয়েই আজ যুদ্ধে যোগদান করতে হবে।

রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীরা কি যোগদান করেনি?

আগেই বলেছি ভুটকোর মেজাজের খবর—দুর্বোধ্য নয় অবোধ্য।

আমরা কিছু বলার আগেই ভুটকো আবৃত্তি করে বসল—

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে—
জাগিয়া উঠিল হাহারবে—
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে—
ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা?

রত্নাকর শেঠ পারল না। সামন্ত জয়সেন পারল না। চাষী ধর্মপাল পারল না।

তখন এগিয়ে এল অনাথপিণ্ডদ সুতা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া—

বুদ্ধের চরণ রেণু লয়ে
মুক্তকণ্ঠে কহিল বিনয়ে
"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া"

যখন আর কেউ যাচ্ছে না তখন মারীবিরোধী অভিযানে সবান্ধবে ভুটকোই যাবে। সুতরাং ভুটকো কথা দিয়ে দিল।

ভুটকোর কাণ্ডই ওই রকম। তোর বান্ধব বলতে তো এক আমি আর জ্যাঠা।

না, জ্যাঠামশাই নন, আমাদেরই সহপাঠী এক বন্ধু। তার কিছু কিছু জ্যাঠাসুলভ চরিত্রের জন্যে আমরা তাকে জ্যাঠা বলতুম। তা সবান্ধবে প্রতিশ্রুতি দেবার আগে একবার বান্ধবদের মতামত নে। তা নয় ভুটকোর হল বলং বলং বাহুবলং—ও যখন বলেছে তখন যেতেই হবে।

অভিযানটা যদি ভগবান রামচন্দ্রের হয়ও ভুটকো একেবারে নেহাৎ কাঠবিড়াল নয়—ও হল আসলে পবননন্দন হনুমান। সুতরাং ওর সঙ্গে না গেলে ও লঙ্কাকাণ্ড করবে।

তাইতে আমরাও অনুরোধে ঢেঁকি গিললাম। দল ঠিক হল– আমি, ভুটকো আর জ্যাঠা।

তারপর উদ্যোগ পর্ব।

আমাদের নেতারা আমাদের বোঝালেন, এ যুদ্ধে প্রয়োজন তিনটে জিনিসের। প্রথমতঃ জনবল, দ্বিতীয়তঃ অর্থ আর তৃতীয়তঃ ওষুধ।

জনবল সম্বন্ধে আমরা শুনলাম ঢাকা জেলার কয়েকজন মেডিক্যাল ছাত্র এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করছেন। সুতরাং ঠিক হল ঢাকা জেলা থেকেই আমাদের অভিযান শুরু হবে।

তারপর অর্থ। কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে তা যোগাড় মন্দ হল না। প্রায় দুশো টাকা সংগ্রহ হল। তা আমাদের খরচই বা এমন কি? যাব তো থার্ড ক্লাসে। থাকবো কারো না কারো বাড়িতে—খাবার বন্দোবস্তও পরের ওপরে। সুতরাং দেড়শ টাকার ওষুধপত্র কেনা যাবে। কিনেও ফেললাম তাই।

তাছাড়া কিছু কিছু ওষুধ সংগ্রহও করলাম।

ম্যালেরিয়ার জন্যে যোগাড় হল কিছু কুইনিন। আমাশার জন্যে যোগাড় হল কুটজাবলেহ এক সের। কুটজাবলেহ আবার বদ্যিগিন্নী জানে না। কুটজকুসুম —কাব্যের কুটজকুসুম যাকে বাংলায় কুর্চিফুল বলে।

সেই মেঘদূতের যক্ষ যে ফুল দিয়ে মেঘের অভ্যর্থনা করে কুশল প্রশ্ন করেছিল?

প্রত্যাসন্নেনভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ
প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥

শ্রাবণ মাস ক্রমে ঘনিয়ে এলে যক্ষ নিজের কুশল সংবাদ বিরহকাতর প্রিয়ার

কাছে প্রেরণ করার জন্যে মেঘের শরণাপন্ন হবেন ঠিক করে কুটজকুসুমের অর্ঘ্য সাজিয়ে মেঘের অভ্যর্থনা আর কুশল প্রশ্ন করেছিলেন। এ সেই কুটজ কুসুম।

তবে আমরা অবিশ্যি কুর্চি ফুলের রস বিশেষ বুঝি না কোনদিনই। যক্ষ যোগাড় করেছিল কুর্চি ফুল তার মেঘদূতকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আর আমরা যোগাড় করলাম কুর্চিছাল আমাশার জন্যে।

কুর্চিছাল দিয়ে তৈরি হয় আমাশার ওষুধ। প্রধান যে দু-রকম আমাশা আছে—অ্যামিবিক আর ব্যাসিলারী দুটোর বিরুদ্ধেই কুর্চির ক্রিয়া আছে বলে দেখা গিয়েছে। আমাদের পাশ্চাত্য ভেষজশাস্ত্রে অবিশ্যি আমাশার ওষুধ কম নেই, কিন্তু সেগুলো কিনতে অর্থের প্রয়োজন হত। অথচ কুটজাবলেহ পাওয়া গেল বিনি পয়সায়।

সেইরকম কলেরার বিরুদ্ধে সংগ্রহ করা গেল কলেরা ভ্যাকসিন ইত্যাদি।

ভুটকোর খুব উৎসাহ। সে যাবেই, কিন্তু আমাদের উৎসাহে ক্রমশই ভাটা পড়ে আসছিল। এই সম্বল নিয়ে যাব মহামারীর বিরুদ্ধে লড়তে? যুদ্ধ আমরা করতে রাজী আছি, কিন্তু নিরস্ত্র হয়ে সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়ার কোন অর্থ হয়? এই সামান্য ওষুধে মহামারীগ্রস্ত একটা মহকুমায় আমরা কী করতে পারি?

কিন্তু ভুটকোর যুক্তির অভাব হয় না—যেমন অভাব হয় না দুবৃর্ত্তের ছলের। সে এক কবিতা আবৃত্তি করে বসল—

যথাসাধ্য ভালো বলে ওগো আরো ভালো
কোন্ দেব-নিকেতন কর তুমি আলো?
আরো ভালো কেঁদে কয় আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়।

সুতরাং আমরা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করব আমাদের দেশের লোককে বাঁচাতে কিন্তু কতটুকু পারব সে বিচার করে লাভ নেই।

বুঝলাম বড় বড় নেতারা ভুটকোর মাথা চর্বণ করেছেন।

তাইতে শেষ পর্যন্ত একদিন ঢাকা মেলে চেপে বসতে হল।

আমরা মোট তিনজন। ভুটকো, আমি আর জ্যাঠা। সঙ্গে আছে খাকী প্যাণ্ট আর ভালো প্যাণ্ট, সাদা জামা আর রঙীন জামা, মায় কলাই করা দু-একটি থালা গেলাস পর্যন্ত। কিন্তু কম্বলেরই অসুবিধা, লেপ, তোষক আর নিলাম

না—বড্ড ওজন। তাইতে কম্বল সংগ্রহ করা হল, কিন্তু কম্বল পাওয়া গেল মোটে দুটো, অথচ লোক আমরা তিনজন, ভুটকো কিন্তু দমে না। গ্রামে খড় আছে তাতেই নাকি শীত ভাঙবে।

আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে আমাদের কলেজের ছাত্ররা। আরও অন্যান্য সব কলেজের ছাত্ররা। সবাই আমাদের অভিনন্দন জানাল। আমরা খুব বড় কাজ করতে যাচ্ছি—বিরাট কাজ করতে যাচ্ছি—মহৎ কাজ করতে যাচ্ছি এইসব বলল। নেতারা বক্তৃতা করলেন, দেশের কথা বললেন, দশের কথা বললেন, জনগণের কথা বললেন, স্বাধীনতার কথা বললেন, খুব হাততালি পড়ল, প্ল্যাটফর্মে লোক দাঁড়িয়ে গেল।

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে উপদেশ দিলেন।

কতবড় বিপদ আর আমরা কত কম করতে পারছি এ ভেবে আমরা যেন হতাশ না হই। আমাদের তিনজনের প্রচেষ্টায় কতটুকুই বা হতে পারে ভাবা আমাদের পক্ষে মূর্খতা। এই বিপদের দিনে আমরা যদি একটা লোককেও বাঁচাতে পারি—একজন দুস্থেরও সামান্যতম সাহায্য করতে পারি সেটাও একটা বিরাট দেশসেবা বলে ভাবতে হবে।

মাঠে পাকা ধান পড়ে আছে, কাটার লোক নেই। কোন কাজ যদি নাও পারি, মাঠের ধানও যদি কেটে দিয়ে আসতে পারি তাহলেও তো এই দুর্ভিক্ষের পর কারো না কারো ঘরে ক্ষুধার অন্ন পৌঁছবে।

নেতারা বক্তৃতা শেষ করলেন। আমাদের গাড়িও রওনা হল—পিঁইই-হুস্-হুস্। ছাত্রদের শ্লোগান দূরে দূরে ক্রমশই শোনার বাইরে মিলিয়ে গেল।

ভোরবেলা গিয়ে আমরা গোয়ালন্দে পৌঁছলাম। শীতের ভোরে পদ্মার পাড়ের অনুভূতি অপূর্ব। শীত—হ্যাঁ খুবই শীত। কিন্তু কোথায় আমাদের বাগবাজারের বটগাছতলার ঘাট আর গঙ্গা আর কোথায় গোয়ালন্দের পদ্মা। শীতলপাটির মত শীতের পদ্মা যেন মোহ ধরিয়ে দিয়েছিল সেদিনকার তরুণ চোখে। জ্যাঠার শাসন আর ভুটকোর গোয়ার্তুমি সবই কেমন যেন ভুলে গেলাম সেদিন।

আর ভুলে নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম, তাছাড়া ভুটকোর কথায় রাজী হই কখনো? ভুটকো প্রস্তাব করলো, গোয়ালন্দ থেকে দেশী নৌকোয় পার হয়ে ওপারে গিয়ে সেখান থেকে হাঁটা পথে কোন রকমে ঘিওরের খাল পেরিয়ে গিয়ে আমরা আমাদের প্রথম কর্মস্থলে হাজির হব। ভুটকোর পাল্লায় পড়ে অনেক রকম

বে-কায়দায় পড়েছি কিন্তু তার এই প্রস্তাবে রাজী হওয়া যে কত বড় বোকামি হবে তা তখনও ঠাওর করতে পারিনি।

নৌকোয় করে নদী পার হওয়াটা তো খুবই আরামের। শীতের সকালের মিঠে রোদ আর ঠাণ্ডা হাওয়া মিশিয়ে এমনিতেই অপূর্ব লাগে—তার ওপর যদি তার সঙ্গে জ্যাঠার প্রবোধ বাক্য মেশে তাহলে তো কথাই নেই।

জ্যাঠার বক্তব্য হল আমাদের কর্মক্ষেত্রে অধিকাংশই মুসলমান সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই। হিন্দু হলে বরং কিছু ভয় থাকতে পারত, যেমন······।

দু-মাস আগে জ্যাঠা গিয়েছিল মামা-বাড়িতে মেদিনীপুরে। সেখানে কলেরার মড়ক লেগেছে তখন। দুর্ভিক্ষের পরের মড়ক—গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে দেখছে না—যে যে-দিকে পারছে পালাচ্ছে। সমস্ত মনুষ্যধর্মই দুর্ভিক্ষের সময় সবাই খাদ্যাভাবে খেয়ে ফেলেছে। সুতরাং তারও বালাই নেই।

তাহলে কলেরা ঠেকায় কে? মানুষও নেই—বিজ্ঞানও নেই—উপায় কি? শেষে কয়েকটা গ্রামের মাতব্বর মিলে ঠিক করলেন হরি সংকীর্তন করা যাক, হরিনামে সর্ব ভয় দূর হয় আর কলেরার ভয় দূর হবে না?

জ্যাঠা ঘোর নাস্তিক। নাস্তিক দু-রকম, এক শান্তিপ্রিয় নাস্তিক। ভগবানই হোন আর দেবতাই হোন আর অপদেবতাই হোন তারা কিছুই মানেন না। তবে আর কেউ যদি মানে তাদের সঙ্গে শান্তিপ্রিয় নাস্তিকদের কোন বিরোধ নেই।

আর এক রকম হল লড়ুয়ে নাস্তিক। তারা ভগবান, দেবতা, অপদেবতা কোন কিছুর নাম শুনলেই তাড়া করে যান, ঠিক লাল কাপড় দেখলে ষাঁড় কিংবা লাল ঝাণ্ডা দেখলে আমেরিকানদের মত।

জ্যাঠা হল শেষের দলের, যে-কোন রোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র তা সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।

কিন্তু দু-মাস আগে মেদিনীপুরে জ্যাঠা যেন দু-হাজার বছর আগের তাম্রলিপ্তিতে গিয়ে পড়েছিল। বিজ্ঞান সেখান থেকে যুদ্ধ আর দারিদ্র্যের তাড়া খেয়ে কোথায় যে পালিয়েছে জ্যাঠা আর তাকে খুঁজেই পেল না। তাইতে জ্যাঠাও কীর্তনের দলে মেতে গেল। শুধু কি তাই, চাঁদা সে নিজে তো দিলই মামার কাছ থেকে সংগ্রহও করে দিল।

আমরা সবাই জ্যাঠার এই ট্র্যাজেডিতে সত্যিকারের সমবেদনা জানালাম, এ তো বাঘের ঘাস খাবার চাইতেও বড় ট্র্যাজেডি।

জ্যাঠা কিন্তু বলল, না তা নয় ওটা কোন ট্র্যাজেডিই নয়। আসল ট্র্যাজেডি আরও করুণ। সে হল……।

চাঁদা তো সংগ্রহ হল কিন্তু কীর্তন এখন করে কে? আশে-পাশে যে-কটা কীর্তনের দল ছিল কোনটা মরে সাফ হয়ে গেছে আবার কোনটা দেশ ছেড়ে উৎখাত হয়ে গিয়েছে। শেষে অনেক কষ্টে একটা দল যদি বা পাওয়া গেল তাদের আবার দর দৈনিক পাঁচ টাকা। থাকার ভিতরে তো মোটে একটা খোল, একজোড়া করতাল আর ছুটো গায়েন। তাদের থাকা-খাওয়া তো দিতেই হবে, আবার তার ওপরে দিনে পাঁচ টাকা করে দক্ষিণা, কিন্তু উপায় কি? বিপদে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাতেই রাজী হতে হল।

কিন্তু ছু-দিন যেতে না যেতেই তারা বেঁকে বসল। কলেরায় যারা মরেছে তারা সবাই ভূত হয়েছে। রাত্রিবেলা এসে তারা কীর্তনীয়াদের ওপর অত্যাচার করছে। সুতরাং রোজ আরও ছু-টাকা বাড়িয়ে না দিলে তারা আর কীর্তন করতে পারবে না। জ্যাঠারা কিন্তু তাতে রাজী হয় না।

কীর্তনীয়ারা থাকত জ্যাঠার মামা-বাড়িরই বাইরের একটা ঘরে। সেদিন রাত ছুপুরে একটা প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি আর্তনাদ শুনে জ্যাঠা, তার মামা, মামাতো ভাই সবাই হন্ত-দন্ত হয়ে কীর্তনীয়াদের ঘরে গিয়ে দেখে ভীষণ ব্যাপার।

একটা গায়েন ঘরের বাইরে উঠোনে চিত হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে। আর তাকে ঘিরে ধরে বাকি তিনজন কেউ জল দিচ্ছে, কেউ হাওয়া করছে আর একসঙ্গে 'রাম, রাম, রাম, রাম' করে আর্তনাদ করছে।

প্রশ্ন করে ঘটনাটা জানা গেল।

ভূতেরা কিছুদিন থেকে ওদের পিছনে লেগেছিল। কিন্তু ওরা ঘরের দরজা জানলা সর্বত্রই রাম নাম লিখে রাখাতে এতদিন আর ভূতেরা কোন কায়দা করতে পারেনি। সেদিন বড্ড গরম পড়াতে ওরা সব দরজা জানলার সামনেই শুয়েছিল, ঘুমের ভিতরে ওই গায়েনের পা-টা গিয়ে পড়েছে চৌকাঠের বাইরে ভূতেরাও নিশ্চয়ই তাকে তাকেই ছিল। ব্যাস্ তারাও ওর পা ধরে টান টান্তে টান্তে হিড় হিড় করে নিয়েই যেত। কিন্তু ওর চিৎকারে আর তিনজন জেগে গিয়ে তারাও মুণ্ডু ধরে পাল্টা টান শুরু করল। ওরা তিনজন হলে কি হবে? ভূতেদের গায়ে জোর অনেক বেশী, তাছাড়া ওরা অনেক বেশী জোরে টানতে সাহসও করছিল না। মুণ্ডুটা যদি ছিঁড়ে যায়?

শেষ পর্যন্ত ভূতেরা ওদের উঠোন অবধি এনে ফেলেছে। ভাগ্যে জ্যাঠারা এসে পড়েছিল না হলে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে ?

তাছাড়া এ ভূতেরা নিশ্চয়ই ওলাবিবির চেলা—তার মানে মামদো। আর মাম্‌দোরা তো ভয়ংকর ভূত...

গল্প শুনতে শুনতে আমার আর ভূটকোর তো প্রায় পেট ফেটে সার্জিকেল কেস্‌ হবার যোগাড়। কিন্তু জ্যাঠা আরও গম্ভীর হয়ে গেল।

আমরা হাসলেও জ্যাঠাকে সেদিন সবই বিশ্বাস করতে হয়েছিল। শুধু বিশ্বাসই নয় দৈনিক দু-টাকা করে মামদো অ্যালাউন্স স্যাংশানও করতে হয়েছিল।

পদ্মার ওপারে শিবালয়। কেউ কেউ বলে আইরচা উলাইল।

আইরচা উলাইলের মানে বোঝা শক্ত—নেহাৎই প্রাকৃত ভাষা। বুঝিও না আমরা। শিবালয় মানে বোধ হয়—শিবের বাড়ি। তবে কৈলাসের যেসব বর্ণনা আমরা জনশ্রুতিতে শুনেছি তার সঙ্গে মিলের বড় অভাব। কৈলাস পাহাড় কিন্তু এর কাছাকাছি একটি টিবিও নেই। তবে হ্যাঁ, জায়গা জংলা—বেশ জঙ্গল।

ও আরও একটা মিল আছে সেটা বুঝলাম পরে। শিবালয় কৈলাসের মতই দুর্গম স্থান ; একপাশে পদ্মা, আর অন্যদিকে ভাঙা জংলা রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে পুরো একদিন হাঁটলে ঘিওরের খাল পেরিয়ে গিয়ে তবে আমাদের গন্তব্যস্থল পয়লা তেরশ্রী গ্রামে পৌঁছব। পদব্রজে যাওয়া ছাড়া উপায়ও কিছু দেখলাম না। ভূটকো কেন আমরা নিজেরাও নিজেদের বহন করতে পারতাম। কিন্তু মালপত্রগুলো ?

ভূটকো কিন্তু ঘাবড়ায় না মোটে। তিন মন মাল। তিনজনে কাঁধে তুলে নিলে মাথা পিছু মোটে একমন করে পড়ে। সে আর এমন বেশী কি ?

অর্থাৎ শিবালয়ে এসে আমাদের মহাদেবের বাহন ষাঁড় না হয়ে বলদ হতে হবে। আমি তো তখুনি নৌকোয় করে কলকাতা ফেরার প্রস্তাব পেশ করলাম। জ্যাঠাও তথৈবচ। ভূটকো তখন একটু ভাবতে বসল। যাই হোক তিন মন মাল একা ভূটকোর পক্ষে ভূটকো হলেও বেশী হয়ে যায়।

ভূটকো কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে গিয়ে একটা বাহন যোগাড় করে ফেলল। না শিবালয়ের বাহন ষাঁড় নয়। একটা গাড়িই বটে—নাম পাল্কী-গাড়ি, বড়সড় একটা প্যাকিং বাক্স গোছের জিনিস। তার তলায় লম্বালম্বিভাবে দুটো বাঁশ

লাগানো। নরম বাঁশ নয়। রীতিমত পাকা ভালো বাঁশ। বাঁশ দুটো আবার বাক্সের সামনের দিকটা ছাড়িয়েও বেশ খানিকটা বেরিয়ে আছে। বাঁশের একদম সামনেটা ঘোড়ার কাঁধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর বাক্সের ঠিক সামনে আড়াআড়িভাবে চারটে বাঁশ বেঁধে গাড়োয়ানের বসবার জায়গা। সেই প্যাকিং বাক্স—না বাক্স নয় গাড়ি—তার ভিতরে আমাদের মাল উঠলো, বিছানা-পত্র উঠলো, আমাদের ভুটকোও উঠলো, ভুটকো আমাদেরও অনুরোধ করলো উঠতে। আমি উঠলাম না প্রাণের ভয়ে। জ্যাঠা উঠলো না নৈতিক কারণে। দুর্ভিক্ষের পর ঘোড়া এখনও তার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পায়নি। সুতরাং তার ওপর এত ভার চাপানোর কোন অর্থ ই হয় না, পশু হলেও তার ওপর অত্যাচার অন্যায়।

সুতরাং ভুটকো চলল গাড়িতে, দুটো চাকা যখন তখন তো গাড়িই বলা উচিত। আমরা দুজন চললাম দু-পাশে হেঁটে হেঁটে। হাতে লাঠি নিয়ে নয় অবশ্য দাঁতন নিয়ে।

কয়েক মাইল দিব্যি চললাম, প্রথমে আমাদের একটু ভয় হয়েছিল। ঘোড়াটা হয়তো মারা যাবে কিন্তু শেষে বুঝলাম ও হল নেহাৎই ঘোড়াসুলভ ভড়কি। সব সময়েই মারা যাবার ভয় দেখায় কিন্তু মরে না।

একটু বাদে ভুটকোও ভরসা পেয়ে গাড়ির ভিতর থেকে হেলে-দুলে গান ধরলো—

নাচে তেওয়ারী দুবে,
নাচে চৌবে পাঁড়ে···

জোর খুশি হয়ে ভুটকো গাড়ির ভিতরে নিজেও দোলে আর দুনিয়া সুদ্ধ স্থাবর জঙ্গমকে নাচাতে থাকে। শুধু তেওয়ারী, দুবে, চৌবে পাঁড়ে নয়—লুঙ্গি পরা মিঞা ভাই বার্মিজ ফুঙ্গি পর্যন্ত নাচিয়ে চলল।

আমি সবে জ্যাঠাকে গাল দেওয়া শুরু করব বলে ভাবছি মানে ওর ঘোড়া মারা যাবার ভয়েই তো আমাদের এখন হেঁটে মরতে হচ্ছে। আর ভুটকো দিব্যি মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে গাড়িতে চলেছে।

ঠিক সেই সময় বিপদটা এল। না, বিপদ মানে ঘোড়ার মৃত্যু নয়। আমরা একচক্ষু হরিণীর মত ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠকেই গেলাম।

গাড়ির একটা বাঁশ মাঝখান থেকে ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। ফলে গাড়োয়ান রাস্তায় চিৎপাত, ঘোড়া মাঝ রাস্তায় 'নিলডাউন' আর ভুটকোর মাথা গাড়ির

দেওয়ালে জোর ঠুকে গেল। কিন্তু কেরোসিন কাঠের দেওয়াল তো। মাথায় সুপুরি উঠে গেল, কিন্তু মাথা ফাটল না।

যাই হোক অনেক কষ্টে তো ভূটকো আর ঘোড়াকে উদ্ধার করা গেল কিন্তু তারপর উপায়? এখান থেকে মালপত্র নিয়ে যাই কি করে? সারারাত জেগে, দু-ঘণ্টা হেঁটে তারপর মাঝরাস্তায় তিন মন মাল নিয়ে আমরা পথে বসলাম, একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তখন আমাদের ভরসা দিল গাড়োয়ান। সে তার প্রাকৃত ভাষায় আমাদের বোঝাল, এ হল ঢাকা জেলা—মানিকগঞ্জ মহকুমা। এখানে আর যে অভাবই থাকুক—বাঁশের অভাব হবে না। ও গ্রামে বাঁশ কাটতে যাবে আর ফিরে আসবে।

কিন্তু আমাদের মুখের অবস্থা দেখে বোধ হয় ওর মনে হল আমরা পুরোপুরি ভরসা পাচ্ছি না। সুতরাং সে তার মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল।

আমাদের খিদে পেয়েছে? ও তাতে আর কি? ওর সঙ্গে গাঁয়ে গেলেই ও আমাদের জন্যে মুড়ি মুড়কির বন্দোবস্ত করতে পারে। ও আমরা ভয় পাচ্ছি, মাল-পত্রগুলো কোথায় রেখে যাব? কিছু ভয় নেই। হাসু মিঞার গাড়ি এখানে সবাই চেনে, কেউ ছোঁবেও না। আচ্ছা—তাও ভরসা পাচ্ছি না? বেশ ও ঘোড়াটা খুলে দিয়ে যাচ্ছে। ওর তো ঘোড়া নয় আসলে ডালকুত্তা, সে খোলা থাকলে গাড়ি কেউ ছুঁতেও পারবে না। আর তাও যদি ভরসা না পাই, বেশ আমরা বসেও থাকতে পারি। ও আসবার সময় গরম মুড়ি আর মুড়কি নিয়ে আসবে। তবে এখানে আমাদের হাতমুখ ধুতে অসুবিধা হবে সেই জন্যেই ও গাঁয়ে যাবার কথা বলছিল।

একটু ভেবে শেষ পর্যন্ত আমরা ওই ডালকুত্তার মত ঘোড়ার ভরসায় জিনিসপত্র রেখে চললাম গাঁয়ের দিকে।

হাসু মিঞার চাচার বাড়িতে আমাদের ভজিয়ে দিয়ে হাসু মিঞা একখানা দা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাঁশ কাটতে। না, চাচা মানে সত্যিকারের বাবার ভাই নয়। তবে রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়ায় হাসু মিঞা, চাচা তাই তার সব গাঁয়েই আছে। এই ধরুন আইরচা উলাইল থেকে ঘিওর তেরশ্রী পয়লা পর্যন্ত হাসু মিঞাকে জানে না এমন লোক বড় একটা নেই। সুতরাং এ রকম খ্যাতিমান পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা নিজেদের রীতিমত ভাগ্যবানই মনে করলাম।

কালো, রোগা, আধবয়সী মেয়েলোকটি আমাদের বদনা এগিয়ে দিল মুখহাত

ধোয়ার জন্যে। খিড়কিতে পুকুর আছে। না-না, বদনাটা খারাপ নয়, মুখহাত ধোয়ার জন্যেই ব্যবহার করা হয়। কি আর করবে ওরা। দুর্ভিক্ষের সময় সবই তো বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আগে ওদের পিতলের বদনা ছিল। এখন এসে মাটির বদনায় ঠেকেছে।

কলকাতায় কলের জলের বীজাণু নিয়ে আন্দোলন করা আমাদের অভ্যাস। পুকুরের জলে মুখহাত ধুতে একটু খারাপ লাগবে বৈকি। কিন্তু ধুলাম সেদিন তবে বদনাটা ব্যবহার করতে প্রবৃত্তি হল না।

মুখহাত ধুয়ে শীতের রোদে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে কি রকম প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেল।

আমরা হিন্দু তায় ভদ্রলোক কিন্তু তা সত্ত্বেও চাচীর হাতে খেতে আপত্তি নেই শুনে চাচী ভারী খুশি।

রোগা কালো মেয়েলোকটি সায়া, সেমিজ, ব্লাউজ ছাড়াই আধময়লা শাড়ীটা গেরস্ত ধরনে জড়িয়ে ডালায় করে মুড়ি-মুড়কি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ব্লাউজ নেই, সায়া নেই, সেমিজ নেই, কিন্তু একখানা কাপড়—নেহাৎ দশহাত কাপড়—দিয়ে কী সুন্দরভাবেই না নিজেকে ঢেকেছে। মুখের সামান্য একটু ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আমরা কলকাতার লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম শাড়ীর দিকে আর চাচীর দিকে। না, ছিদ্রান্বেষণে নয় কিন্তু তবুও নজরে পড়ল ছিদ্র।

আমি তাকালাম জ্যাঠার দিকে, জ্যাঠা তাকাল ভুটকোর দিকে, ভুটকো তাকাল আমার দিকে—হ্যাঁ, সবাই দেখেছে।

ডালাটা বাড়িয়ে দেবার সময় চাচীর উলঙ্গ হাতটা দেখা গিয়েছে, মাথাটা ঘোরানোর সময় উলঙ্গ কাঁধ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে।

দেখা গিয়েছে মুখ ছাড়া আর কোথাও তিলধারণের স্থান নেই। সবটাই ভরে আছে সাদা সাদা গুটি বসন্তের মত ফোস্কায়, কিংবা লাল দগদগে ঘায়ে, কিংবা সাদা পচলায় ঢাকা ঘায়ে। গজেন্দ্রগতি আর আব্রুর মানেই কি রকম যেন বিকৃত হয়ে যায়।

সারা শরীরটা আমাদের ঘিনঘিনিয়ে ওঠে। আমরা সবাই তাকাই সবাইকার দিকে।

তারপর চাচীকে বলি পরম অমায়িক স্বরে :

হ্যাঁ, এখন কি করে খাওয়া যায়? হাসু মিঞা আমাদের নিয়ে এসেছে সে না

এলে তো আমরা খেতে পারি না, তারও হয়তো খিদে পেয়েছে।

চাচী উত্তর দেয় প্রাকৃত ভাষায় : হাসু মিঞা তো পিছনে গিয়েছে বাঁশ কাটতে —পিছনে বাঁশঝাড় আছে, সেখানে। তা হাসু মিঞা আসুক না, ততক্ষণ তো আমরা খেয়ে নিতে পারি।

জ্যাঠা আরও ন্যাকা সেজে যায়। সে বলে, আমরা তো কলকাতার ছেলে সবাই। বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটতে কখনো দেখিনি। তাইতে আমরা হাসু মিঞার বাঁশ কাটা দেখতে যাব।

ছুটে একরকম পালিয়ে আমরা বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে। ওখানে থাকলেই হয়তো ওই পচা ঘেয়ো লোকের হাত থেকে মুড়ি খেতে হবে।

পালা—পালা—সবাই গিয়ে হাজির হাসু মিঞার কাছে।

হাসু মিঞা বাঁশ কাটছে ঠক ঠক ঠকাঠক। সে আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

কালো দোহারা চেহারা। লম্বা লম্বা চুল, লুঙ্গিটা গুটিয়ে পরা। খালি গায়ে যে চাদরটা সকালে ছিল—সেটা কোমরে জড়ানো। হাতে একটা মাঝারি গোছের ধারালো দা। কলকাতায় হলে আমরা কি কথা বলতাম ?

কিন্তু এখানে মনে হয় হাসু মিঞা পরম আত্মীয়। কি জানি হয়তো হাসু মিঞার ডালকুত্তার মত ঘোড়াকেও আত্মীয় বলে মনে হবে শেষে।

আমরা নালিশ করি হাসু মিঞাকে। চাচীর পচা ঘায়ের নালিশ। কী ওই ঘা ? বসন্ত ? সিফিলিস্ ? নালিশ করতে গিয়ে গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে।

হাসু মিঞা শোনে। একবার হাসে আবার গম্ভীর হয়, আবার হাসে আবার হয়তো গম্ভীর হয়। তারপর কথা শেষ হয়।

না না, ওগুলো খারাপ কোন ঘা নয়। ও দেখে ভয় পাওয়া হাস্যকর। ওগুলো জলপাঁচড়া, যাকে খোস বলে, ওতো গ্রাম দেশে হয়ই। কিন্তু এবার দুর্ভিক্ষের পর সেই পাঁচড়াই কি রকম বাঘা পাঁচড়া হয়ে গেল। সারা গ্রাম, গ্রামের পর গ্রাম পাঁচড়ায় ছেয়ে গেল। কোন লোক বাকি নেই। কোন লোকের দেহে কোন স্থান বাকি নেই, সব ভরে গিয়েছে খোসে। কেন যে হল ? দুর্ভিক্ষে লোকের রক্তের জোরই কমে গিয়েছে নাকি ? হাসু মিঞা তো চাষা-ভূষো লোক কি করে বলবে ?

আর শুধু পাঁচড়া হচ্ছে তাই-ই নয়, পাঁচড়ায় লোকে মরেও যাচ্ছে। কী-যে অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে এ-বছর—হাসু মিঞার বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষে কেউ দেখেনি।

ও হ্যাঁ, চাচীর একটা ছেলে ছিল। ওই জ্যাঠার বয়সীই একটা ছেলে। তাকে চাচী সব বেচে মায় পিতলের বদনা পর্যন্ত বেচে দুর্ভিক্ষের সময় বাঁচিয়েছে। সেটাও এই সে-দিন মারা গেল পাঁচড়া হয়ে।

আমরা বোকা হয়ে শুনি হাসু মিঞার গল্প।

সত্যি······?

এ-যেন আমরা রাজ-পুত্তুর, মন্ত্রী-পুত্তুর আর কোটাল-পুত্তুর বেরিয়েছি জঙ্গলে শিকার করতে, জঙ্গলে শুনেছি বাঘ আছে। তারা চাষীদের ছাগল ধরে খায়, গোরু ধরে খায়, কায়দা পেলে চাষীদেরও ধরে খায়। আমরা সেই বাঘ মেরে চাষীদের উদ্ধার করব।

ও-বাবা! জঙ্গলে এসে দেখি যারা ধরে খায় তারা আসলে বাঘই নয়। ছিল বিড়াল, বনে এসে বনবিড়াল হয়ে গিয়েছে।

লোক মরছে পাঁচড়ায়—খোসে।

চোরের মত পা টিপে-টিপে আবার চাচীর কাছে ফিরে যাই।

জ্যাঠার বৈজ্ঞানিক মন। খোসের পোকা খেলে কোন অসুখ হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমাদের মুড়ি আর মুড়কি ত্যাগ করার কোন অর্থই হয় না। আমরা মুড়ি খাই আর মুড়কি খাই, হাসু মিঞা বাঁশ কাটে ঠক্-ঠক্ ঠক্কা ঠক্।

সামান্য গন্ধক—এক তোলারও হয়তো দশ ভাগের এক ভাগ গন্ধক পেলে চাচীর ছেলে বেঁচে যেত। চাচীও হয়তো সেরে যেত।

কিন্তু জতু-গৃহের জন্যে গন্ধকের অভাব হয় না—যত অভাব চাচীর বেলায়। সামান্য জ্ঞান, সামান্য অর্থ—তার জন্যে কি চাচী দায়ী?

আমাদের চোখের সামনে ঘৃণ্য চাচী অত্যাচারিতের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাধারণ বাংলা দেশের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে।

চাচা গুণগুণিয়ে কি যেন বলে, বাঙাল দেশের ভাষা সব বোঝাও যায় না। আমার যেন মনে হল বলছে—

মন্বন্তরে মরিনিক মোরা
মারী নিয়ে ঘর করি।

না-না, চাচী তা বলছে না। ভুটকো ঠিক ধরেছে। চাচী জিজ্ঞেস করছে, আমরা আরো মুড়ি খাব নাকি? হ্যাঁ, ভুটকো আরো খাবে। ও-সব কবিতা টবিতার ধার ভুটকো ধারে না। সে এতক্ষণে ভেবে নিয়েছে আমাদের ওষুধের বাক্সে গন্ধক আছে।

হাসু মিঞার বাঁশ লাগাতে লাগাতে ভুটকো গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মিলিয়ে কিছু লোক জড়ো করে ফেলেছে। হাসু মিঞা বাঁশ লাগানোর পরেও ভুটকো দেখি বক্তৃতা দিয়েই চলেছে :

'এই গন্ধক যদি পাঁচ সের নারকেল তেলে মিশিয়ে নিতে পারেন তাহলে সাড়ে পাঁচ সের মলম হবে। এই মলমে খোস সারবেই সারবে। রোজ একবার করে এই মলম লাগাবেন। তিন দিন পরে নিজেরা ক্ষার সাবান দিয়ে স্নান করবেন। আর এতদিনের ব্যবহার করা জামা,কাপড়, গামছা, বিছানার চাদর গরম জলে সিদ্ধ করবেন, এ-ওষুধ বিনে পয়সার ওষুধ হলেও ধন্বন্তরি।'

ভুটকোর হাতে এক পাউণ্ড গন্ধকের একটা প্যাকেট।

হাসু মিঞার গাড়ি ছাড়তে ছাড়তে দুপুর প্রায় গড়িয়ে যায়। ভুটকোর লজ্জা নেই, ও আবার গিয়ে বসে ওই গাড়িতে। আমরা দুজন আবার চলতে শুরু করি দু-পাশে।

ভুটকোর দিকে তাকিয়ে দেখি। মহাভারতে অর্জুনের নিবাতকবচ বধের কাহিনী মনে আছে? পাশুপত অস্ত্র গিয়ে অর্জুন ইন্দ্রত্রাস অসুর নিবাতকবচকে বধ করেছিলেন?

ভুটকোর ভাবখানা তখন যেন—ভুটকো হল নিবাতকবচবিজয়ী অর্জুন—এই গাড়ি হল ইন্দ্ররথ আর আমাদের হাসু মিঞা মাতলি।

ভুটকো আবার গান ধরে হেলে-দুলে—

নাচে তেওয়ারী দুবে
নাচে চৌবে পাঁড়ে।

ঘিওর বন্দর—ঘিওর গ্রাম—ঘিওর খাল—ঘিওরের হাট—মানে শুধু ঘি-এর চাইতে ঘিওরের নাম-ডাক ওখানে কোন অংশেই কম নয়।

খালের পারে এসে আমাদের রথ থামল। আর যাবে না। তখন রাত হয়েছে। আমরা কলকাতা ছেড়েছি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা।

আর মাইল তিন-চার হাঁটা পথে গেলেই পয়লা গ্রামে আমাদের জন্যে আশ্রয় ঠিক হয়েছে।

হাসু মিঞা বড় শরীফ লোক। ঘিওরের হাটেও মুড়ির বন্দোবস্তও সেই করে দিল। তা ছাড়া ও ঠিক করে দিল আমাদের তিন মন মাল তিন মাইল নিয়ে যাবার লোক।

শীতের রাত—সবে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। যেখানে এসেছি তার ত্রিশ-

চল্লিশ মাইলের ভিতরেও কোন রেল লাইন নেই। হাসু মিঞা আর চাচীর দৌলতে কিন্তু খুব অপরিচিত মনে হয় না জায়গাটা।

পকেটে কাঁচা লঙ্কা, কোঁচড়ে গরম মুড়ি তেল দিয়ে মাখা, ভুটকো তো তখন লাট সাহেব। কিন্তু তবুও ভুটকোর তাড়া, তাড়াতাড়ি চল। আরও তাড়া-তাড়ি। জ্যাঠা শেষে রীতিমত বিরক্ত হয়ে যায়। যে কোন কাজই করতে হলে ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তে করতে হয় অন্তত জ্যাঠার তাই মত। ভুটকোর হুটো-পাটি তাড়াহুড়ো তাইতে জ্যাঠা মোটেই পছন্দ করে না।

মাইল-দুই এসে শেষে জ্যাঠা রীতিমত রেগে যায়। অত তাড়াতাড়ি করবার দরকার কি? কাল রাতে রওনা হয়েছ এখনও চলছই—ট্রেনে চড়লে—নৌকায় চড়লে—রথে চড়লে, হেঁটে চললে—তাও কি বাপু তোমাদের উৎসাহের শেষ নেই? আর উৎসাহ বেশী থাকে তাতে ক্ষতি নেই, বরং ভালোই, কিন্তু উৎসাহের বাজে খরচ করে লাভ কি?

'শালা জ্যাঠা' ভুটকো রীতিমত খেঁকিয়ে ওঠে। চায়ের জন্যে দৌড়ান হল অনর্থক, তাহলে সার্থক কারণটা কি? স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দৌড়ান? যাকে বলে আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্?

পয়লার বাসস্থান জমিদারের গেস্ট হাউস্। ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া—খড়ের চাল—মাটির মেঝে। বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। শুধু তাই নয় তক্তপোশও পাতা আছে। বাঁশের খুঁটি পুঁতে মাচা মত করা—তাকে খাটও বলতে পারো তক্তপোশও বলতে পারো। সামনে একটা ৫।৭ বিঘা দিঘি।

তবে খুব রাজসিক লোকের উপযোগী নয়। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মাদির ব্যবস্থা প্রকৃতির কোলেই। সে উন্মুক্তও হতে পারে আবার একটু গাছের আড়ালেও হতে পারে।

সুতরাং অতিথিরা সাধারণতঃ নিশ্চয়ই খুব অভিজাত নন।

আমাদের আগেই দুপুর বেলা এসে আশ্রয় নিয়েছে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্ররা। সংখ্যায় তারাও তিনজন—সুতরাং তিনে আর তিনে ছয় হল।

ভুটকোর সংখ্যার চাইতেও বেশী আনন্দ হল গোছানো চায়ের সরঞ্জাম দেখে। এর অর্থ হল দুপুরে চা একপ্রস্থ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং!

স্টোভ-এর গর্জন শুরু হল। হো হো হো হো স্টোভের আওয়াজ হতে থাকে আর ভুটকো বেরিয়ে যায় গামছা কাঁধে নিয়ে হাতমুখ ধুতে। ভুটকো হাত

ধোয়, মুখ ধোয়, গেস্ট হাউসের খাবার ঘর দেখে। রান্নাঘর দেখে, চাকরের সঙ্গে আলাপ করে, রাঁধুনী বামুনের সঙ্গে আলাপ করে।

আর ফিরে এসে গরম গরম চা আর আবার সেই মুড়ি খায়।

তারপর ডাক পড়ে খাবার। খাবার ঘরের মাটির মেঝেতে পিঁড়ি পাতা। আমরা ছ-জন বসেছি সার দিয়ে। তিনবার মুড়ি খেয়েও খিদে আমাদের একটুও কমেনি।

প্রথমে ভাতটা ভেঙে নিলুম পরিপাটি করে—তারপর তাতে ঢাললাম বাটি থেকে সুগন্ধি ডাল। তারপর বড় একগ্রাস মুখে তুলে গপ্ করে গিলে ফেললাম।

আঃ! সারাদিনের পরিশ্রমের পরে ডাল-ভাতেও যে কী স্বাদ!

কিন্তু তারপরেই মুহূর্তের ভিতরে আমি আর জ্যাঠা খাবার ফেলে এক লাফ। ঝালে মুখ জ্বালা করছে, ঠোঁট জ্বালা করছে, খাদ্যনালী জ্বালা করছে, পাকস্থলী জ্বালা করছে—ডালে হাত দিয়েছিলাম তাতে আঙুলের মাথা পর্যন্ত জ্বালা করছে। উঃ লঙ্কাবাটায় কী জ্বালা! গেলাসের জলে যায় না, কুয়োর জলে যায় না, হাঁ করে হা-হা করলে হাওয়ায় যায় না। আমি আর জ্যাঠা মুখ হাঁ করে হাঁপাতে থাকি গ্রীষ্মকালের দুপুরের কুকুরের মত। মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে তা-ও ওই কুকুরের মত।

ভুটকোর দিকে তাকিয়ে দেখি ভুটকোও হাঁ করে বসে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে। তবে হাঁপাচ্ছে না—হাসছে, বেজায় হাসছে।

এই হল ভুটকো। চা হবার সময় ও রান্নাঘর, খাবার ঘর সব দেখেছে। লঙ্কা বাঁটার পরিমাণ দেখেছে। আর সেই সময়ই সংগ্রহ করে রেখেছে বেশ খানিকটা লেবু আর তেঁতুল। সেই টক দিয়ে ঝাল মেরে নিয়ে ও দিব্যি একপেট ভাত খেয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে—আমাদের দুরবস্থা দেখে ফ্যাক ফ্যাক করে দাঁত বার করে হাসছে।

বল কারো সহ্য হয় এইরকম বদ রসিকতা?

আমাদের কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ ঘিওর আর দৌলৎপুর থানায়। পরদিন সকাল থেকে কাজ শুরু করতে হবে।

ঢাকার ছেলেরা রিপোর্ট নিয়েছে এখানকার প্রধান অসুখ হল ম্যালেরিয়া জ্বর। আর প্রধান অসুবিধা হল কুইনিন কিংবা যে কোন ম্যালেরিয়া-বিরোধী ওষুধের অভাব। আমরা হিসাব করে দেখলাম আমাদের কাছে যা কুইনিন আছে তাতে প্রায় একশ লোকের চিকিৎসা করা যেতে পারে।

কিন্তু এত অল্প ওষুধে কী করা সম্ভব ?

ভূটকো বলে, সম্ভব। এই ওষুধ নিয়ে আমরা যাব গ্রামে গ্রামে। সেখানকার অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করব আমাদের সঙ্গে আসতে। তারপর আমরা হাজার হাজার লোক বাধ্য করব মহকুমা হাকিমকে কুইনিন কিংবা অন্য কোন ওষুধের বন্দোবস্ত করতে।

তাই ঠিক। ভূটকোর কথায় প্রতিবাদ করে সাধ্যি কার ?

তিনজন করে এক দলে, একজন কলকাতা, একজন ঢাকা আর একজন চিকিৎসক শ্রেণী বহির্ভূত। তিনটে দল তিনদিকে আমরা বেরিয়ে গেলাম।

আমরা সবাই যখন ফিরলাম তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়েছে।

স্নানাহার সেরে পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে মাঠের ভিতরে সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম লাগছে ?

ইতিহাস তিনটে হলেও আসলে একই।

তিন দলই পলায়ন করেছে।

গ্রামের লোকেরা তাড়া করেনি, তাড়া করেছে ম্যালেরিয়া জ্বর।

ধু ধু করে মাঠ। তার মাঝে ছোট ছোট এক একখানা গ্রাম। রাস্তার পাশ দিয়ে অনেক বাড়ি আছে। তবে অধিকাংশ ভিটেই সাধারণ জমির চাইতে বেশ খানিকটা উঁচু। অনেক ভিটে তো প্রায় দূর থেকে টিলার মত মনে হয়।

শীতের সকালের মিঠে রোদে মাঠে বেরলে মনটা একটা হাল্কা মিঠে সুরে চলে যায়। মাঠের সবুজ সোনালী রঙ, সোনালী রোদ আর দূরে দূরে ভিটের গোড়া থেকে উঁচু পর্যন্ত তামাক গাছের গাঢ় সবুজ রঙ—রঙে রঙে মনটাতেও যেন রঙ ধরিয়ে দেয়।

প্রথম শীতের এমনিতেই একটা মোহ আছে। ভোরবেলা বন্ধ ইট-কাঠের ঘরে লেপ মুড়ি দিয়েও তখন কলকাতা শহরের ট্রামের তারের শব্দ বেহালা বাজায়, রাস্তায় জল দেওয়া কল খোলার আওয়াজে মৃদঙ্গ বাজে।

আর প্রকৃতির এই রঙের মাতামাতিতে মনে রঙ ধরে যাওয়া আর বিচিত্র কি ?

ঢাকার একটি ছেলে, কলকাতার একটি ছেলে আর স্থানীয় একটি ছেলে তিনজনে মিলে এক একটা দল।

গ্রামে ঢুকে পরিচয় দিতে হয় কলকাতা থেকে ডাক্তার এসেছে।

তারপর একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

হাড় জিরজিরে জোয়ান ছেলে খালি গায়ে ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে বেরিয়ে আসে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর চকচকে চোখে খিদে চকচক করে, কুইনিন এনেছ? কুইনিন? ছেঁড়া কাপড়ে আব্রু ঢেকে সোমত্ত বউ জিজ্ঞাসা করে ফিসফিসিয়ে। তার লকলকে জিব আর শুকনো ঠোঁট শুধোয়, কুইনিন এনেছ? কুইনিন?

চামড়ায় ঢাকা হাড়সার শিশুর মূর্তি বেরোয় টলতে টলতে, আধো আধো গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, কুইনিন, কুইনিন।

আমরা বার করি আমাদের যাদুকরের ঝাঁপি।

মরণাপন্ন সন্তানকে কুইনিন ইন্‌জেকশান দিয়ে মাকে বলি, ভয় নেই তুমি কুইনিন খাও। ছেলেকে খাওয়াও। মা দু-হাত জোড় করে বাড়িয়ে দেয় অমৃত গ্রহণ করবে বলে।

মৃত্যুভয়-ত্রস্তা হরিণীর মত কিশোরী বধূকে ইন্‌জেকশান দিই, তার স্বামীকে দিই অমৃত—মানে কুইনিন বড়ি।

ডাক্তার হবার আগেই এই সাফল্য—যেন গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

কিন্তু একি? ভিড় তো কমে না, ভিড় বেড়ে ওঠে ক্রমশ। সারা গাঁ যেন এক সাথে বেরিয়ে আসে—কুইনিন, কুইনিন।

কিন্তু যাদুকরের ঝোলার অমৃতের ভাণ্ডার তো আর অফুরন্ত নয়, এক সময় শেষ হয়ে যায়।

জ্যাঠা বলে তার সঙ্গে লোক গেলে সে ওষুধ পাঠিয়ে দিতে পারে। সারা গাঁ তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। দু-তিন জোড়া চোখ তিরস্কার করে সরবে আর নীরবে। গাঁয়ে লোক কোথায়? কঠিন ম্যালেরিয়াতে সবাই অশক্ত, সবাই মৃত্যুপথযাত্রী, কেউ একটু এগিয়ে আছে, কেউ একটু পিছিয়ে।

আমাদের ইন্‌জেকশান ফুরিয়ে যায় কয়েক মিনিটেই। আমরা বলি, কাল আসব আবার ইন্‌জেকশান নিয়ে। অসুস্থ মা পা জড়িয়ে ধরে—তার মরণোন্মুখ সন্তানকে কুইনিন ইন্‌জেকশান দিতে অনুরোধ করে, ওরকম ঘাড় মাথা শক্ত হয়ে এক ছেলে গিয়েছে। ও রোগ হলে কি আর কাল পর্যন্ত বাঁচে? লুঙ্গি পরা মিঞা অবাক হয়ে যায় নির্বোধ কলকাতা-ফেরৎ ডাক্তারের অর্থহীন স্তোকে। ওর স্ত্রীর যে রকম আমরক্ত পায়খানা হচ্ছে আর যে রকম জ্বর হয়েছে তাতে কি কাল অবধি কোন লোক বাঁচে?

আমরা বুঝি, আমরা চিনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিনি এ্যালজিড টাইপ আর সেরিব্রাল টাইপের ম্যালিগনাণ্ট ম্যালেরিয়া।

ভূটকোর দল প্রতিজ্ঞা করে, আবার আসবে, কুইনিন নিয়ে আসবে। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না, ভূটকো ওদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে—ওরা আবার আসবে, কুইনিন পেলে কুইনিন নিয়ে আসবে, না পেলেও ওদের সঙ্গে থাকবে এক সঙ্গে কুইনিন খুঁজবে। আর শুধু কুইনিন খোঁজা কেন? জীবনে-মরণে, কুইনিন খোঁজায়, ধান কাটায় সর্বক্ষেত্রেই ভূটকো ওদের সঙ্গে থাকবে।

ওদের চোখ হাসে। ওদের ফ্যাকাশে ঠোঁটগুলো বেঁকে গিয়ে হাসে। ওদের হাড় জির-জিরে বুক আর পিলে বার করা টিনটিনে পেটগুলো কেঁপে কেঁপে হাসে।

ভূটকো পালায়, বক্তৃতা শেষ না করেই পালায়। সিরিঞ্জ না গুছিয়েই ব্যাগে পুরে পালায়। স্টেথোস্কোপ ঘাড়ে না ঝুলিয়ে ঝোলায় লুকিয়ে পালায়।

আমরা সবাই মিলে তাইতে যুক্তি করি। বিকেলের পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে মিঠে মিঠে শীতের দিনে।

শেষে ঠিক হয় কার্যক্রম। আমাদের পুঁজির কুইনিনের অর্ধেক তো আজই শেষ হয়েছে। বাকি অর্ধেক শেষ হবে কাল বের হলেই। সুতরাং কালই চেষ্টা করতে হবে—সম্ভব হলে কাল বিকেলেই চেষ্টা করতে হবে।

যত গ্রাম থেকে সম্ভব—যে কজন লোক সম্ভব জড়ো করে কালই যদি সম্ভব হয় তাহলে কালই রওনা হব ঘিওরের খাল দিয়ে—বেউথা নদী দিয়ে চলে যাব সদরে। সেখানে মহকুমা হাকিমকে বলব—আমরা সবাই বলব, আমরা মরে যাচ্ছি মহকুমার মালিক—দেশের মালিক, আমাদের বাঁচাও।

পরদিন সকালে চা হল মুড়ি হল। পোশাক পরা হল, ওষুধ নেওয়া হল, তারপর সবাই রওনা হলাম একসঙ্গে। গেস্ট-হাউসের চাকরকে বলে দিলাম, রাতে আমরা খাব না।

হয়তো আমরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোক সংগ্রহ করব—হয়তো আমরা ঘিওরের খাল দিয়ে বেউথা নদী দিয়ে সদরে যাব। তারপর হয়তো ফিরব টিন টিন কুইনিন নিয়ে, সগর্বে এসে দাঁড়াব ঘিওরের হাটে। হাতে রাশি রাশি কুইনিন।

তখন কি আর জানতুম জীবনের একটা বৃহত্তম পলায়নের দিন সেদিন! আমাদের নয় শুধু, ভূটকোরও। পলায়ন করাই তো আমাদের বৃত্তি। কিন্তু

ভুটকো—মহাপালোয়ান অসমসাহসী ভুটকোর পলায়নের দিন যে সে-দিন তা কি আর জানতুম ?

আমরা কি আর জানতুম—আমাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতার উত্তরে নিষ্প্রভ মরণোন্মুখ লোকগুলোর চোখ জ্বলে উঠবে এই সব অকর্মণ্য বাক-সর্বস্ব শহুরে লোকদের প্রতি ঘৃণায়।

আমরা কি জানতুম মৃত সন্তানের মৃতকল্পা মায়ের হতাশা আমাদের তাড়া করবে গ্রাম থেকে। আমরা কি জানতুম এ্যালজিড টাইপ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্বামীর দীর্ঘশ্বাস এত ভয়াবহ ? আমরা কি জানতুম মৃতা মায়ের বুকের ওপর শিশুর কান্না এমন তীব্র ঘৃণায় আমাদের তাড়া করে নিয়ে যেতে পারে ?

তা জানলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বেত্রাহত কুকুরের মত আমরা নিশ্চয় সেদিন ঘুরে বেড়াতাম না।

কিন্তু ভুটকোর অদম্য উৎসাহেও শেষ পর্যন্ত ভাটা পড়ে। স্টেথোস্কোপ লুকিয়ে আমরা যখন পয়লা গ্রামের দিকে পালাচ্ছি তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হতাশ, অভুক্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে আমরা ফিরছি। আমাদের প্রত্যাবর্তন পরাজিত সৈনিকের লজ্জাকর পলায়নের মত।

ছোট একটা জলা পার হতে হল যখন তখন সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে। এক হাঁটু জল। পূতিগন্ধে ভরা। স্থানীয় তিনজন বলল—এই রাস্তাই সোজা। পিছনে নির্জন জঙ্গল, সামনে অন্ধকার জলা—আস্তে আস্তে পা বাড়াই।

সেদিন কি আমাদের যাত্রাই অশুভ হয়েছিল ? নইলে একহাঁটু জলে আমাদের জ্যাঠার পা হড়কাবে কেন ? আর হড়কালেই বা—তাই সামলাতে জ্যাঠা ধরবি তো ধর যেটা চেপে ধরলে সেটা একটা পচা-গলা শিশুর শবই বা হবে কেন ?

কি জানি। কিন্তু সেই অন্ধকারে নির্জন মাঠের মাঝখানে জলা পার হয়ে আমরা কি রকম ভূতগ্রস্তের মত এগিয়ে চলি লোকালয়ের আশায়। যে মানুষের তাড়া খেয়ে সারাদিন আমরা পালিয়ে বেড়িয়েছি সেই মানুষের বসতির সন্ধানে আমরা মরিয়া হয়ে এগোতে থাকি।

দৌড়তে দৌড়তে শেষ পর্যন্ত আমরা একটা ভাঙা কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। শুধু ভয় নয়—ক্ষুধা তৃষ্ণাও আমাদের পেয়েছিল প্রচুর।

কেন যে মনে হয়েছিল সে বাড়িতে লোক আছে তা আজও বুঝতে পারি না। সারা গ্রাম পেরিয়ে এসে একটা লোকও তো দেখিনি। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি

করেও যখন দরজা খুলল না তখন জোর করে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

দরজা খুলতেই অন্ধকারে কী সব যেন খস্ খস্ করে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে খস্ খস্ আওয়াজে কী রকম ভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হল।

কিন্তু নিবন্ত মেটে মেটে টর্চের আলোয় যা দেখলাম সে দৃশ্য মনে হলে এখনও সারা গা শিউরে ওঠে।

ওই জলা পেরিয়ে আমরা কি প্রেতলোকে পৌঁচেছি ?

অন্ধকার ঘরে খড়ের ওপর একটা শুকনো অস্থিচর্মসার দেহ শায়িত। চোখ দুটো গর্তে, হাড়গুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে শুকনো ঠোঁটের ভিতর দিয়ে। কিন্তু মনে হল লোকটা বেঁচে আছে এখনও। ভুটকো আরও কাছে এগিয়ে গেল টর্চ নিয়ে। গালের আর পাছার মাংস শেয়ালে খেতে শুরু করেছে।

ভুটকো কাছে যেতে প্রেতটা একটু নড়ে উঠলো। আমরা শিউরে উঠলাম কিন্তু কি যেন বলল লোকটা—একটা ভৌতিক গোছের আওয়াজ বের হল মুখ দিয়ে আর হাত দুটো যেন হঠাৎ এগিয়ে এল ভুটকোকে ধরতে। সরু সরু লম্বা লম্বা অস্থিচর্মসার শেয়ালে-খাওয়া দুটো হাত।

তারপরেই ভুটকো ছুট। সে কী দৌড়! ওরকম পালাতে ভুটকোকে কখনো দেখিনি।

দু-মাইল ম্যারাথন রেসের পর ভুটকো এসে গেস্ট হাউসে উঠলো।

তারপর স্নান খাওয়া পর্যন্ত আর কোন কথাই ভুটকো বলে না। আমরাও এরকম ভৌতিক ব্যাপারে কিরকম যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

শেষে শোবার সময় ভুটকোকে জিজ্ঞাসা করলাম—'প্রেতটা কি বলছিল ?'

ভুটকো বলল, 'কি জানি। আমার তো মনে হল নাকী সুরে বলছে, কুইনিন কুইনিন।'

বদ্যিগিন্নী বলল, 'তারপর ?'

সতু বদ্যি বলে, 'তারপর আবার কি ? এই হল ভুটকোর পলায়ন।'

বদ্যিগিন্নী চটে যায়—'বলই না।'

সতু বদ্যি আবার বলা শুরু করে। এবার কিন্তু ভুটকোর পলায়ন নয় এবার পরিশিষ্ট।

তারপর রাত হল। আরও শীত পড়ল। আরও অন্ধকার হল। পয়লা গ্রামের জমিদারের গেস্ট হাউসের বাঁশের মাচায় তিন বন্ধু শুয়ে পড়ল।

বাঁশের মাচা—তার ওপর এক হাত পুরু খড়। তার ওপরে একটা চাদর। তার ওপরে পাশাপাশি তিন বন্ধু। জ্যাঠা, মাঝখানে ভূটকো আর একপাশে সতু বদ্যি। আর তারও ওপরে দুটো কম্বল চাপা দেয়া। একটা কম্বলের তিন ভাগের দু-ভাগ জ্যাঠা আর একভাগ ভূটকো। আর অন্য কম্বলের তিন ভাগের দু-ভাগ সতু বদ্যি আর একভাগ ভূটকো।

রাত যত বাড়ে—অন্ধকারও তত বাড়ে—শীতও বাড়ে। বাইরে হিম পড়া বাড়ে—ছঁ্যাচা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উত্তুরে হাওয়া মনে হয় যেন হাড়ের ভিতরে ফুঁ দিচ্ছে।

কিন্তু কারো ঘুম ভাঙে না, কেবল সবাই আরও একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে শোয়। আরও রাত হয়। বাইরে কুকুরেরা শীতে কাঁদতে থাকে। রাত জাগা পাখীরা চাঁদকে না পেয়ে তারার সঙ্গে ঝগড়া করে। শীত আরও বাড়ে—ওরা আরও ঘেঁষাঘেঁষি করে শোয়।

ওদের ঘুম ভাঙে না।

তবে ঘুম শেষ পর্যন্ত ওদের ভাঙে। রাত শেষ না হতেই ভাঙে।

কিন্তু ভাঙে প্রচণ্ড কিল-চড়ের ঘায়ে। একপাশে ছিল সতু বদ্যি, সে তো প্রথম ঘুষিতেই বিছানা ছেড়ে লম্বা দিতে দিতেও আরও তিন চারটে ঘুষি তার গায়ে এসে পড়ে। জ্যাঠাও তথৈবচ।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে জ্যাঠা আর সতু বদ্যি। ঘুমের ঘোরটা কাটলে পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে।

নাঃ, ভূটকো ঘুমের ঘোরে বেপরোয়া হাত চালিয়েই চলেছে।

কেউ কাছে যেতে সাহস পায় না। ওই রকম দুশমনের মত চেহারা।

কিন্তু হল কি? ঘুমের ভিতরে কি ভূটকো ক্ষেপে গেল? না, সন্ধ্যাবেলা দেখা ভূত রাত দুপুরে এসে ওর কাঁধে ভর করল?

না, ও সব কিছুই নয়। ঠাণ্ডা জল দিয়ে ভূটকোর ঘুম ভাঙিয়ে ব্যাপারটা বোঝা গেল।

অনেক যখন রাত হয়েছে, আর খুব যখন শীত পড়েছে আর বেড়ার ভিতর দিয়ে যখন ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ের ভিতরে ফুঁ দিচ্ছে—আর আরও যখন শীত পড়েছে তখন ভূটকো স্বপ্ন দেখছে।

দেখছে আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। দেখছে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দেখছে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সে বৃষ্টিতে জল নেই খালি শিলা। কিন্তু কুড়োতে গিয়ে দেখে—আরে! এ তো শিলা নয়—এ যে কুইনিনের বড়ি। রাশি রাশি কুইনিনের বড়ি আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে।

ভুটকো তাই স্বপ্নের ভিতরে বড়িগুলো লুফে লুফে নিচ্ছিল। ভলি বাস্কেট চ্যাম্পিয়ন ভুটকো কি করে লুফতে হয় তা ভালোই জানে। তাইতে ভুটকো যাতে একটা বড়িও নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা করছিল। এই হল ভুটকোর স্বপ্ন।

কিন্তু বদ্যিগিন্নীর কৌতুহলের তখনো শেষ নেই। তারপরেও আবার জিজ্ঞাসা করে—'তারপর?'

শরতের রাত আরও গভীর হয়েছে। গল্প বলতে বলতে সতু বদ্যি ঝিমোতে থাকে, বদ্যিগিন্নীও।

বদ্যিগিন্নী ঘুমুতে ঘুমুতে একটু একটু শোনে। স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টারকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে তার চোরাবাজারের কুইনিন গ্রামের লোকদের ভিতরে বিলিয়ে দেবার খবর, শোনে মহকুমা হাকিম আর কলকাতার জনসাধারণের কাছ থেকে কুইনিন সংগ্রহের খবর।

স্বপ্নের মত শোনে সেই ঘিওর আর দৌলৎপুরের গ্রামে গ্রামে ভুটকোর বীরদর্পে কুইনিন বিতরণের গল্প। শুনতে শুনতে বদ্যি গিন্নী কখন ঘুমিয়ে পড়ে। তার ঘুম যখন ভাঙে তখনও সতু বদ্যি ঘুমুচ্ছে অঘোরে। তাড়াতাড়ি কোনরকমে শাড়ীটা পালটে নিয়ে বদ্যিগিন্নী গিয়ে হাজির হয় ভুটকোর বাসায় ভুটকো গিন্নীর কাছে। গিয়ে সোজা কথাটা পাড়ে।

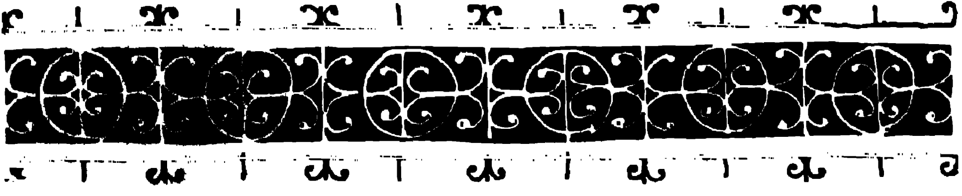
বাড়িটা তাহলে নেয়া হোক। একসঙ্গে থাকবে বদ্যিগিন্নী আর ভুটকো-গিন্নী দুই বোনের মত।

ভুটকো-গিন্নী অবাক হয়ে যায়—'কিন্তু ভাই তোমার কর্তা বলল না যে ভুটকো গুণ্ডা, সে ভুটকোর সঙ্গে কোনক্রমেই থাকবে না—'

'থাকবে না?' বদ্যিগিন্নী মিষ্টি হেসে বলে—'আমি যা বলব তাই হবে। সতু বদ্যি ওরকম অনেক তড়পায়, কিন্তু তা বলে আমার কথার ওপরে কিছু বলতে সাহস পায় না। জান না—

সতুবদ্যি কা ঘানি—
আধা জল আধা পানি

ওতে তেল নেই।'



মওত্‌কা দরওয়াজা

চোখ ছুটো চক্‌চক্‌ করে।

সাদা দাড়ি আর গভীর বাদামী গায়ের রঙের মাঝখানে ঘোলাটে একটু ভেজা ভেজা চকচকে চোখে লোকটা তাকিয়ে থাকে ডাক্তার সাহেবের দিকে।

হ্যাঁ, এ যুক্তির সামনে সতু বক্সি একেবারে কাত। জসিমুদ্দিনের ইলাজের জন্যে কলিমুদ্দিন রুপেয়ার ইস্তিজামের ওয়াদা দিয়েছিল। সে কথা তো কলিমুদ্দিন অস্বীকার করছে না। প্রথম কথা জসিমুদ্দিন সামান্য আঠারো বছরের লেড়কা। তারপর পুরা জিন্দিগী তার সামনে পড়ে রয়েছে। আর শুধু কি তাই? ওর মা দেহাতে একা থাকে। তার মরদ্‌ও নেই। আর কোন লেড়কাও নেই। আর জমিনও নেই। এর ওর বাড়ি খেটে ভিখ্‌ মেগে কোন রকমে খায়। তার সিরফ্‌ একই লেড়কা। তার হয়েছে টি-বি কা সিকায়েৎ। ফেপড়াতে হয়নি বটে তবে গলার বীচিতে তো হয়েছে। টি-বি হল আসল ইবলিশের বাচ্চা সয়তান। সেই জন্যে কলিমুদ্দিন এগিয়ে এসেছিল জসিমুদ্দিনকে বাঁচাতে। জসিমুদ্দিনের ক্ষমতা তো ও জানে। মানে রোজগার করে ৩৫৲ টাকা, তাতে সে নিজে কি খাবে আর ডাক্তারকেই বা কি দেবে? অবিশ্যি কলিমুদ্দিনও এমন কিছু আমীর নয়। প্রায় পঁচিশ সাল নোকরি করে ওর তনখা হয়েছে ছেচল্লিশ টাকা। কিন্তু কারখানায় সব লোক মিলিয়ে প্রায় চল্লিশজন মজদুর হবে। ত্রিশ থেকে পচাশ তক রোজগার সবাই করে। তা মাথা পিছু সবাই যদি মাস গেলে এক রুপেয়া দেয় আর জসিমুদ্দিন দেয় বিশ রুপেয়া তাহলে তো দু-মাসে শও রুপেয়া হয়ে যায়।

তাছাড়া কলিমুদ্দিনকে বস্তির সবাই মানে মুখিয়া বলে, ডাকে বড়ে মিঞা বলে। তাইতে কলিমুদ্দিন এগিয়ে এসে ওয়াদা দিয়েছিল—শ-রুপেয়ার জিম্মেবারি তার। সতু বক্সিকে বলেছিল, হ্যাঁ বিমার সারিয়ে দিন।

তা ছোকরা এখন অনেক ভালোও আছে। আর থাকবেই তো, ডাক্তার

সাহেবের সুইয়া তো যাদুর মত কাজ করে।
কিন্তু টাকা কলিমুদ্দিন যোগাড় করতে পারেনি।
প্রথমতঃ, জসিমুদ্দিন বিশ রুপেয়া কেন একটা রুপেয়াও [illegible]। সে না দেয় রুপেয়া ডাক্তার সাহেবকে—না দেয় তার মাকে। আর নিজেও ভরপেট খায় না। সরমকা বাত্। লেকিন ডাক্তার সাহেবকে তার বলতেই হবে। ভুখা মা, আপনা তন্দুরস্তি, কিছুই সে ইয়াদ রাখে না। খানা ভি ভালো করে খায় না। দেশী সরাব খায়, আর—আর সরম কা বাত্, আঠারো সালের লেড়কা—রেণ্ডিখানায় গিয়ে পড়ে থাকে।
তা ধরুন আঠারো বছর উমরের পঁয়ত্রিশ টাকা তনখার মজদুরের নসীবে তো বেহেশ্ত্-এর হুরী মিলবে না—মিলবে কেলে কুচ্ছিত বুঢ্টী।
বলুন তো কী লজ্জার কথা!
আর জসিমুদ্দিনের আদত্ দেখে কারখানার আর সবাইও বিগ্ড়ে গিয়েছে। তারা বলেছে, মাস গেলে আমদানী তো ত্রিশ-চল্লিশ রুপেয়া। তার থেকে একটা রুপেয়া খিঁচে বের করা আর কলিজা থেকে লোহু টেনে বের করাতে ফারাক খুব বেশী নয়। কিন্তু যে নিজে জাহান্নমের সড়ক পাকাপাকি বেছে নিয়েছে তার জন্যে কলিজার লোহু কেন আঁখসে এক বুঁদ পানি বার করাও হারাম।
সুতরাং কলিমুদ্দিন এখন কী করবে? ডাক্তারবাবুর কাছে ওয়াদা দিয়েছে—শ-রুপেয়ার জিম্মা নিয়েছে। ডাক্তারবাবু যদি বলেন তবে কলিমুদ্দিন—বড়ে মিঞা কলিমুদ্দিন—নিজের জেব থেকে শও রুপেয়া দিয়ে দেবে। লেকিন কলিমুদ্দিনের জেব তো আর খুব বড় নয়! তাইতে মাসে মাসে কিস্তিতে শোধ করতে হবে টাকা।
তবে আপসোস জসিমুদ্দিনের জন্যে—আপসোস জসিমের মায়ের জন্যে। মাত্র আঠারো বছর বয়স—আর জসিম চলেছে জাহান্নমে? আর তার মা? সে বুঢ্টীর কি হবে?
কলিমুদ্দিন সোজা তাকায়। সতু বক্সির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে। আধভেজা চোখ দুটো চকচক করে। চকচকে চোখে প্রশ্ন ভাসে। ঘৃণা আর ভালবাসা ভাসে—দুটো চোখেই একসঙ্গে।
তাকিয়ে তাকিয়ে সতু বক্সি ভাবে। না—এ ভাব লিখে সবাইকে জানানো সতু বক্সির ক্ষমতার বাইরে।

পরস্পরবিরোধী ভাবের সংমিশ্রণে নাকি মহৎ কাব্যের সৃষ্টি হয়। সতু বদ্যি শুনেছে লোকমুখে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কাব্যের ভিতরে নাকি নাটকই শ্রেষ্ঠ। আবার নাটকের ভিতরে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান শকুন্তলা। আর অভিজ্ঞান শকুন্তলার ভিতরে শ্রেষ্ঠ চতুর্থ অঙ্ক—যেখানে শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করছেন। সেখানে পরস্পরবিরোধী ভাবের সংমিশ্রণ হয়েছে—শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সুখ আর শকুন্তলা ও আশ্রমের বিচ্ছেদের দুঃখ এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে মহৎকাব্যের রসঘন চিত্র। কিন্তু তার চিত্রকর কালিদাস। মহাকবি কালিদাস—বাল্মিকীর মানসপুত্র ব্যাসের মানসশিষ্য—মহাকবি কালিদাস।

কিন্তু কলিমুদ্দিনের চোখের ঘৃণা আর ভালবাসার উদার সংমিশ্রণ—বাদামী রঙের চামড়া আর সাদা ও কালো রঙের দাড়ির মাঝে ঘোলাটে ভেজা ভেজা চকচকে দুটো চোখের বিবরণ কে লিখবে?

সতু বদ্যি পারবে না কাগজে কলমে চিরদিনের জন্যে তা লিখে রাখতে—তাইতেই হয়তো গাঁথা হয়ে রইল চোখ দুটো সতু বদ্যির মনে—'ও দুটি নয়ন তারা—'

তা তো হল। কিন্তু প্রশ্ন? প্রশ্নের উত্তর কি দেবে? একশ টাকার প্রশ্ন? সে কি মাপ করে দেবে? না কলিমুদ্দিনের কাছ থেকে মাসে মাসে নেবে?

একটু ভেবে সতু বদ্যি টাকাটা নেবে না বলেই ঠিক করে।

ইনসানের জন্যে দরদ আর বড়ে মিঞার মত প্রভাবশালী লোককে হাতে রাখার ইচ্ছা—এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাব আবার মিশে যায়।

ডাকটর সাহেবের দিলের প্রশংসায় কলিমুদ্দিন আবার ভিজে ওঠে।

কলিমুদ্দিন চলে যায় আস্তে আস্তে। কিন্তু সতু বদ্যির কেমন যেন খারাপ লাগতে থাকে। জসিমের গলার গ্রন্থির ভিতরকার যক্ষ্মাবীজাণুদের সতু বদ্যি কায়দা করে এনেছিল—কোন সন্দেহই ছিল না তাদের চরম পরাজয় সম্বন্ধে। কিন্তু জয়ের চরম মুহূর্তে সতু বদ্যিকে পিছু হঠতে হচ্ছে। আর সেও যক্ষ্মাবীজাণুর ভয়ে নয়। যাই হোক কলিমুদ্দিনের কথার সত্যতা প্রমাণ হয়ে যায় ক-দিন বাদেই। না, সন্দেহ সতু বদ্যি কলিমুদ্দিনের কথায় করেনি। কারখানার কেউই যে টাকা দিতে চায়নি সে কথা তার মুখ থেকে শুনেই সতু বদ্যি মেনে নিয়েছিল। আপত্তি করবে কেন? সন্দেহ মনে এলে তবে তো আপত্তির প্রশ্ন। কিন্তু তবুও যখন শালিকরামের টাইফয়েডের চিকিৎসার জন্যে ওদের বস্তিতে যেতে

হল আর সেখানে কর্পূর কারখানার সব মজদুরের সঙ্গে দেখা হল এবং কলিমুদ্দিনের কথার সত্যতা অযাচিতভাবেই প্রকাশ পেল—তখন আরও ভালো লাগল।

শালিকরামের অসুখে সতু বদ্যির ডাক পড়ল একেবারে বেহুঁশ হয়ে যাবার পর। শালিকরামের জ্বর হচ্ছিল প্রায় ৮।১০ দিন থেকে। প্রথম প্রথম জ্বরটা সামান্যই থাকত তবে মাথা ধরাতেই কষ্ট পেত বেশী। তা সে সামনের পানের দোকানে দু-আনা পয়সা দিলেই দুটো বড়ি পাওয়া যায়—তা খেলে মাথা ধরাও কমে জ্বরও কমে। না, সে সতু বদ্যির কাছে যায়নি। সতু বদ্যির কাছে আনাগোনা তো বেশী বড়ে মিঞার। কিন্তু সেই কলিমুদ্দিনই প্রথমে যেতে রাজী হল না। কি করে রাজী হয়? সে বলল—তারা যেমন ন্যাপথলিন বল স্ট্রাইকাসি (Stearic Acid) বানিয়ে খায় তেমনি ডাক্তার সাবও তো ডাক্তারি করে খায়—তাকে বার বার মুফ্‌তে ডাকতে বড়ে মিঞার সরম লাগে। তাছাড়া সেদিন ডাকটর সাব বলতে গেলে এক রকম শ-রুপেয়া খয়রাতি করে দিয়েছে। তাতে আর কারো কিছু না হলেও বড়ে মিঞার নাক কাটা গিয়েছে। সেখানে গিয়ে ফের মাথা উঁচু করে কি করে কলিমুদ্দিন দাঁড়াবে।

কিন্তু সেই যাওয়া কলিমুদ্দিনের যেতে হল। আর এমন সময় যেতে হল যখন শালিকরাম বেহুঁশ—একেবারে বেহুশ। চোখ ঘোলা হয়ে গিয়েছে। ডাকলে সাড়া দেয় না। হাত দিয়ে মুঠো করে খালি কি যেন আঁকড়ে ধরতে চায়। আর বিড় বিড় করে কি যেন বলে যার মানে বোঝা শক্ত।

সুতরাং সতু বদ্যিকে যেতে হয়। যেতে অবিশ্যি সতু বদ্যির ভালো লাগে না। সতু বদ্যির গাড়ির তো সারথি নেই। নিজেকেই চালাতে হয় গাড়ি।

রেল লাইন পেরিয়ে বস্তি অঞ্চল দিয়ে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে—মিনিটে ষাটবার হর্ন বাজিয়ে আর দশবার গিয়ার বদলিয়ে চক্রব্যূহের মত ভিড় ঠেলে যাওয়া যে কী কষ্টকর তা যে গিয়েছে সেই বলতে পারে। তবে রোগী দেখা এমন কিছু গোলমেলে ব্যাপার নয়। এ রোগী সতু বদ্যি চেনে —রোজ দেখে—একাধিক দেখে। এ হল টাইফয়েড—আসল জাত টাইফয়েড।

সতু বদ্যি নাড়ী দেখে, পেট দেখে, যন্ত্র দিয়ে বুক পরীক্ষা করে, জিব দেখে, তার-পর ব্যাগ গোছাতে থাকে।

হঠাৎ শালিকরাম আবার বিড় বিড় করে কি যেন বলতে থাকে। সতু বদ্যি কান পেতে শোনে। ভালো বোঝা যায় না—একে টাইফয়েড রোগীর নাকী সুরে

মিনমিনে কথা তার ওপর গোরখপুরের গ্রাম্য ভাষা বোঝা শক্ত। শেষ পর্যন্ত সতু বক্সি তা বোঝার প্রচেষ্টা প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল। শালিকরাম এই সময় যদি একটু জোরে আওয়াজ না করত তাহলে সতু বক্সি হয়তো বুঝতেই পারত না। শালিকরাম জোরে আওয়াজ করে—কিন্তু উত্তেজিত হয় না। যেন কোন বাচ্চাকে আদর করছে এইভাবে মিষ্টি করে বলতে থাকে—'আও বাবা—আ যাও—চিড়িয়া কা আণ্ডা আ যাও—চচু।'

অর্থ বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সতু বক্সি চারদিকে তাকায়। ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছে লোকে। ফার্নেস ঘরের আগুনে শুকনো হামিদ আর মজিদ এসেছে—ন্যাপথলিন ঘরের আবদুল করিম ও সৈফুল্লা এসেছে, দরোয়ান রাম অবতার এসেছে, পাকিং ডিপার্টের বৃন্দাবন এসেছে—বস্তির ঘর বারান্দা সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সবাই পাল্টা প্রশ্নে তাকায় ডাক্তার সাহেবের দিকে।

'শালিকরাম বলে কি ?' সতু বক্সি প্রশ্ন করে। 'চিড়িয়া কা আণ্ডা ? ওর ছেলের নাম নাকি ?'

'না না—ওর ছেলের নাম নয়।' উত্তর দেয় ন্যাপথলিন ঘরের সৈফুল্লা। শালিকরাম ন্যাপথলিন ঘরে কাজ করত কিনা তাইতে বলছে। ন্যাপথলিন ঘরে মাথার ওপর থেকে গুঁড়ো ন্যাপথলিন মেশিনের ভিতরে আসে আর মেশিনে সেই ন্যাপথলিন ছোট ছোট পাখীর ডিমের মত বল হয়ে টুপ টুপ করে ট্রেতে এসে পড়ে। শালিকরাম ভারি রঙ্গপ্রিয় লোক তাইতে কলের সামনে দাড়িয়ে ও ওই রকম বলত : 'আ আ। আও বাবা—চিড়িয়া কা আণ্ডা, আ যাও—চচু...'

'ও...' সতু বক্সি এবার বুঝতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে বড় চিন্তিতও হয়। এরকম কঠিন অবস্থায় না পড়লে এরা কি কখনো ডাক্তার ডাকবে না ? এর এখুনি দরকার ক্লোরাম ফেনিকল—ভিটামিন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পথ্য—আর পরিচর্যা চব্বিশ ঘণ্টা।

কে করবে ?

ওর নিজের লোক তো সব দেশে। আর বস্তির অন্যান্য লোকেরা ? জসিমুদ্দিনের চরিত্র বিচার করে তাকে ওরা ত্যাগই করেছিল। কিন্তু ডাক্তার তো আর রোগীর চরিত্র বিচার করে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

আজ কি ওদের ওপরে বিশ্বাস করা যাবে ? কে জানে শালিকরাম চরিত্রে ঋষি শুকদেব না মহারাজ অগ্নিবর্ণ। আর সে বিচারের মালিক তো এই সব

অশিক্ষিত ভোজপুরী আর পশ্চিমা মুসলমান কুলি।

তাছাড়া একে হাসপাতালে ভর্তি করা। তার কি হবে?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সতু বক্সি তাকায়—ক্যালেণ্ডারের ছবি আঁটা দেয়ালের দিকে ভাঙা বাঁশের গরাদ দেয়া জানলার দিকে—মাটি ওঠা দেয়ালে—ভিড় জমা দরজায়। 'ক্যা শোচতে হেঁ...' কলিমুদ্দিনের ধমকে সতু বক্সির চমক ভাঙে।

না—ভাববে আর কি? তবে সমস্যা তো বটে। আস্তে আস্তে সতু বক্সি কলিমুদ্দিনকে শালিকরামের সমস্যা বুঝিয়ে বলে। কে ইলাজ করবে—সে সমস্যা নয়। সমস্যা তদ্বিরের। তারপর তো সব তক্‌দীরের সওয়াল।

কেন? কলিমুদ্দিন গর্জন করে ওঠে। কলিমুদ্দিন তদ্বির করবে। সবাই তদ্বির করবে। টাকা লাগে তো চাঁদা ওঠাবে। আজ শালিকরামের বিমার হয়েছে কাল হামিদের হতে পারে পরশু মজিদের হতে পারে। মদৎ সবার দিতে হবে। তাই না?

কলিমুদ্দিন তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আর সবার দিকে। অনেকে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। অনেকের চোখ বলে—হ্যাঁ, কলিমুদ্দিন ঠিকই বলেছে। আর অনেকের সারা মুখই বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

কলিমুদ্দিন তাকায় সতু বক্সির দিকে। ততক্ষণে সতু বক্সি কাগজ কলম বার করে লিখতে শুরু করে দিয়েছে।

সতু বক্সির মনে প্রশ্ন জাগে—শালিকরাম ঋষি শুকদেব না মহাবাজ অগ্নিবর্ণ। কিন্তু ভরসা করে প্রশ্ন করে না—যদি ওরা শালিকরামের জিম্মা ফেরৎ দিয়ে দেয় তাহলে? তখন শালিকরামকে কাঁধে করে ঘুরতে হবে সতু বক্সির। আর এ তো আর সাধারণ শালিক নয়—এ হল শালিকরাম যাকে বাংলায় বলে রাম শালিক।

কিন্তু তবুও মনে প্রশ্ন আসে। কলিমুদ্দিনকে প্রশ্ন করে, জসিম কেমন আছে? জসিমুদ্দিন?

কলিমুদ্দিনকে উত্তর দিতে হয় না, উত্তর দেয় সবাই। ফার্নেসের মজিদ আর হামিদ, হ্যাপথলিনের আবদুল করিম আর সৈফুল্লা—সবাই। তবে জোর গলায় বলে আবদুল করিম।

জসিমের খবর ওরা জানেও না, জানতে চায়ও না। ও নিয়েছে জাহান্নমের রাস্তা। সেদিকে নজর দেবার ইচ্ছে ওদের নেই, সে রাস্তার খবর জানে এক জসিম নিজে আর নয়তো ওর সেই বুঢঢী রেণ্ডি যার বাড়িতে ও পড়ে

থাকে রাতের পর রাত।

সতু বক্সি আশ্বস্ত হয়। কলিমুদ্দিন ঠিকই বলেছিল, পরম বন্ধুর বিশ্বস্ততায় পরম নিশ্চিন্ত হলে লোকে যে রকম আশ্বস্ত হয় ঠিক সেইরকম।

শালিকরাম সেরে ওঠে। কঠিন অসুখ আর কঠিনতর অবস্থায় চিকিৎসা শুরু করা সত্ত্বেও। কলিমুদ্দিনের ঘোলা ঘোলা মেটে রঙের চোখের নজরে, মা'দের শুশ্রূষায়, রাম অবতারের শুভেচ্ছায়—সবার যত্নে।

তারপর আস্তে আস্তে স্মৃতির গর্ভে চাপা পড়ে যায় শালিকরাম আর তার টাইফায়েড। কিন্তু তবু কি চাপা পড়বার যো আছে। নামে কর্পূর কারখানা—কিন্তু উড়ে যাবার কোন লক্ষণই নেই, দু-দিন যেতে না যেতেই আবার এসে হাজির হয় কর্পূর কারখানার ডাক। ডাক্তারখানা পেরিয়ে পুবমুখী রাস্তা পার হতে হয়। দু-পাশের দোতলা তিনতলা কোঠাবাড়ির সার আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে যায়, মাঝে মাঝে একতলা বাড়ি, খোলার চাল, অ্যাসবেস্টস্-এর চাল দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে আবার বাগান ঘেরা বাংলোও চোখে পড়ে, ক্রমে রেল লাইন পেরিয়ে যায়, মানুষের ভিড় বাড়ে। দোকানী আর হাটুরে, মেছুনী আর সব্জীউলির ভিড় বাড়ে। গোরু, মোষ, মানুষ, ছাগল ভিড় করে থাকে রাস্তায়। গাড়ির হর্নকে গ্রাহ্য করে না। মশা, মাছি, পচা ড্রেন, ভাঙা রাস্তা, মোষের শিং, গাড়ির শিঙ্গা সব ব্যাপারেই নিস্পৃহ ভাবে রাস্তা চলে। গাড়ির দরজায় ডানহাত রেখে হেলান দিয়ে সতু বক্সিও নিস্পৃহ ভাবে স্টিয়ারিং ধরে থাকে। গাড়ি চলে চার মাইল পাঁচ মাইল বেগে। দুপুর রোদে রাস্তা ঘাট গরম।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে রাস্তা তেতে আগুন হয়। লোহার পাতে তৈরি গাড়ির দরজা—তাও গরম হয়ে ওঠে। গাড়ির স্টিয়ারিং তাও গরম হয়ে যায়। গরম হাওয়া আর ইঞ্জিনের উত্তাপে চালকের সিটে সতু বক্সিও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবু কর্পূর কারখানায় যেতেই হবে।

সেখানকার ব্যাপার আরও গরম—ফিদা হোসেনের পেট জ্বলে গিয়েছে। পাউরুটির কারখানার উনুনের মত তবে আরও বিরাট ফার্নেসে আলকাতরার তেল চোলাই হয়, তা থেকে নানা জিনিস তৈরি হয় যেমন ন্যাপথলিন। সেখানে দাঁড়িয়ে একজনকে দেখতে হয় কাজকর্ম। না, হাতের কাজ তেমন বিশেষ কিছু নেই, শুধু দাঁড়িয়ে দেখা। সেখানে কাজ করছিল

ফিদা, হঠাৎ চিৎকার শুনে পাশের ল্যাপথলিন ঘর থেকে ছুটে যায় আবদুল করিম আর সৈদুল্লা, গিয়ে দেখে ফিদা মাটিতে পড়ে জবাই করা মুরগীর মত ছটফট করছে আর চিৎকার করছে, আর্তনাদ করছে। তখুনি টেলিফোনে খবর গেল সতু বস্থির কাছে আর সতু বস্থিও সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল কারখানায়।

জবাই করা মুরগীর মত ছটফট করার যথেষ্ট কারণ আছে, প্রায় গোটা পেটই জ্বলে গিয়েছে কিনা তাই। রোগা কালো ছিবড়ে মত লোকটা। অস্থি আছে, মজ্জাও হয়তো আছে তবে মেদ-মাংসের প্রাচুর্য নেই, প্রায় দিগম্বর হয়ে শুয়ে আছে বস্তির ঘরটায়। পেটের কালো চামড়া পুড়ে আরও এক পোঁচ কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুপুর বেলা হলেও ঘরটা বড় অন্ধকার, তাইতে বুকের কালো রঙ আর পেটের আরো কালো রঙ বোঝা শক্ত। পেটের ওপরের চামড়া মাঝে মাঝে উঠে গিয়েছে। কালো জমির ওপরে সাদা দাগগুলো চকৃচক্ করে, বেশ চকচক করে আর তাইতে সতু বস্থি বুঝতে পারে অত অন্ধকার ঘরেও বুঝতে পারে—হ্যাঁ, পেটটা পুড়েছে। লোকটা ছটফট করে, তবে খুব নয়। মুখটা যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে।

নাড়ীর গতি একটু বেশী চঞ্চল, ক্ষীণও বটে। রক্তের চাপ কম, বেশ কম। সাধারণতঃ এত কম হয় না, সুতরাং ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে বলে শক্ তাই চলছে।

আগুনে পোড়া রুগীদের ভিতরে আজকাল বেশীর ভাগ মৃত্যুই হয় এই শকে। পোড়া ঘায়ের দরুন মৃত্যু আজকাল প্রায় হয় না বললেই চলে, তবে পুড়ে যাবার সময়েই শক্-এ প্রচুর মৃত্যু হয়।

এই শক্-এর চিকিৎসা প্রথমতঃ তো ঘুম পাড়ানো, তারপর শিরাপথে নানারকম ওষুধ দেয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চিকিৎসা করা, সর্বক্ষণ দেখা শোনা করা।

তার জন্যে প্রয়োজন হাসপাতাল। হাসপাতালে বিছানা যোগাড় করা সম্ভব, অত্যন্ত ভিড় থাকা সত্ত্বেও সম্ভব। মরণাপন্ন যে সব জরুরী অবস্থা সে সব ক্ষেত্রে হাসপাতালে বিছানা পাওয়া কিছু অসুবিধাজনক নয়। সুতরাং বড়ে মিঞা কলিমুদ্দিনের কাছে সতু বস্থি প্রস্তাব পেশ করে। ফিদা হোসেনকে হাসপাতালেই পাঠানো হোক।

সতু বক্সির প্রস্তাব যেন পাথরে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসে। না, একেও হাস-পাতালে দেয়া হবে না। সতু বক্সিকে চিকিৎসা করতে হবে।

চিকিৎসা কি করে করবে? এর চিকিৎসা যে হয় না এখানে। তবু তর্ক না করে আগে ফিদা হোসেনের জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করে সতু বক্সি। তাকে মরফিয়া ইনজেকশান দেয়। পেনিসিলিন ইনজেকশান দেয়। রুগীকে একটু সুস্থ করার চেষ্টা করে।

তবে একটু সময়ের প্রয়োজন। এতদিন ধরে এই কর্পূর কারখানায় ডাক্তারী করে এদের চরিত্র সতু বক্সির বুদ্ধির অগম্যই রয়ে গেছে। কলি-মুদ্দিনের কথা স্বতন্ত্র। সে সব ব্যাপারেই অন্যান্যদের তুলনায় একটু চিন্তা করে কাজ করার চেষ্টা করে। তাছাড়া সে হল বড়ে মিঞা, সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাকে এদের মনের ভাব আয়নার মত প্রতিফলিত করতে হয়—আর এদের মনের ভাব যে কখন কি হবে তা সতু বক্সি কেন বড়ে মিঞা কলি-মুদ্দিনেরও বুদ্ধির অগম্য। হয়তো ঠিক হল জসিমুদ্দিনকে সাহায্য করতে হবে, তার গলার গ্রন্থির যক্ষা রোগের চিকিৎসার জন্যে সাহায্য করা দরকার আবার কখনও হয়তো তারা ঠিক করবে জসিমউদ্দিন আসল ইবলিশের বাচ্চা শয়তান। আবার কখনও হয়তো শালিকরামের জন্যে রাতের পর রাত জেগে চিকিৎসা শুরু করলো আর কখনও হয়তো পোড়া রুগীর শকের চিকিৎসা করতে সতু বক্সিকে বাধ্য করলো। বৈশাখী সন্ধ্যার মেঘের মত কিংবা তরুণী নারীর মনের মত এদের মন যে কখন কি রঙ নেবে তা জানা দেবতাদেরও অসাধ্য। রুগী ক্রমশ একটু একটু করে শান্ত হতে থাকে আর সতু বক্সি এক একটা করে অস্ত্র প্রয়োগ করে কর্পূর কারখানার কর্মচারীদের মত ফেরানোর জন্যে।

প্রথম যুক্তি ফিদা হোসেনের জিন্দিগীর খতরা আছে সুতরাং ইলাজ ভালো করতে হলে হাসপাতালে ব্যবস্থা করা দরকার।

কিন্তু না, তাদের ডাক্তার সাহেবের চাইতে ভালো ইলাজ কলকাত্তা শহরে হয় বলে ওরা বিশ্বাস করে না। আর তা ছাড়া সিরফ ইস্তিজাম আর দিমাগে ইলাজ হয় না। আসল কথা হল দিলের—বড় বড় হাসপাতালে যে সব বড় বড় ডাক্তার আছে তাদের দিল কি ফিদা হোসেনের কথা চিন্তা করবে। তার চাইতে তাদের চেনা ডাক্তার সতু বক্সি অনেক ভালো।

সতু বক্সি কি করে বোঝায় যে যত বড় দিলই হোক এমন কি আকাশের মত উদার হৃদয়ও যদি হয় তা হলেও কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।"

তখন সতু বক্সি আবার অন্য যুক্তি দেখায়। আচ্ছা ইলাজে তো কাফি রুপেয়ার দরকার। হাসপাতালে হলে হয়তো সে রুপেয়া লাগবে না আর লাগলেও হয়তো মালিকের সঙ্গে লড়াই করে তা উসুল করা যাবে।

এই যুক্তির ফল আরও বিপরীত হয়। কী? রুপেয়ার জন্যে একটা মরণাপন্ন মরিজের ইলাজ হবে না? কর্পুর কারখানায় কি ইনসান নেই না ইনসানিয়াৎ নেই? কত টাকা লাগবে? সবাই সার দিয়ে দাঁড়ায়।

অনেক রকম টাকা দেনেওয়ালা সতু বক্সি দেখেছে। একটি দুটি করে রাই কুড়িয়ে বেল করাই ডাক্তারের কাজ কিন্তু এমন টাকা দেনেওয়ালাকে আপনারা দেখেছেন? হরেক রকম ছিটের হরেক রকম ছাঁটের পোশাকে লজ্জা নিবারণ করে সাতরঙা রঙের ছোপ সর্বাঙ্গে মেখে যারা দাঁড়িয়েছে তারা ধনপতি কুবের নয় এমন কি কুবেরের অনুচর যক্ষও নয়। এ যেন শিবের সাথী প্রেতের দল।

সতু বক্সি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। টাকার কথা আর তুলবে না।

এমনি করে যখন একটির পর একটি যুক্তি সেই পাথরের দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে চলে আসে তখন সতু বক্সি তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে।

এ অস্ত্র প্রয়োগ করার সতু বক্সির ইচ্ছে ছিল না। সতু বক্সির কাছে রুগী রুগী। সে চাষীই হোক আর জমিদারই হোক, মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, বড়লোকই হোক আর গরীব লোকই হোক, মালিকই হোক আর মজুরই হোক--সবাই সমান। কিন্তু উপায় কি? নিজে বাঁচলে তবে তো বাপের নাম সেইজন্যে নিজের ঘাড় থেকে রুগী নামানোর জন্যে সতু বক্সি তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে।

এই যে ফিদা হোসেনের কারখানায় কাজ করতে করতে পেট পুড়ে গেছে এ জন্যে তো সব দায়িত্ব মালিকের নেয়া উচিত। কিন্তু মালিক যদি সহজভাবে তা না নেয় তা হলে? তা হলে তো মালিকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটিরও প্রয়োজন হবে। সে ক্ষেত্রে ফিদা হোসেনের জখম সম্পর্কে হাসপাতালের সাক্ষীর যে দাম হবে সতু বক্সির সাক্ষীর সে দাম আইনের চোখে কখনই হবে না। আর এখন তো ফিদা হোসেন একটু ভালো হয়েছে, বাকী চিকিৎসার জন্যে সে হাসপাতালেই থাক। সেখানে সতু বক্সি কড়া নজর রাখবে। প্রেমের চাইতে যুদ্ধে নাকি মুক্তি অনেক কাছে। অন্তত শাস্ত্রে রাবণ হিরণ্যকশিপুর কাহিনীতে তাই মনে হয়। এক্ষেত্রেও সতু

বস্তি ফিদা হোসেনের প্রতি দরদ দেখিয়ে যা পারল না মালিকের প্রতি ঘৃণার সুযোগে তাই করতে সক্ষম হল। কর্পূর কারখানায় মজুররা শেষ পর্যন্ত ফিদা হোসেনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে রাজী হল আর সতু বস্তিও শুধু একটা কঠিন রোগের চিকিৎসার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেল তাই নয় ভবিষ্যতে কোর্ট পুলিস সাক্ষীসাবুদ এসবের হাত থেকেও রেহাই পেল। রেহাই অবিশ্যি কর্পূর কারখানা থেকে কখনই পাওয়া যাবে না। সেখানে যেন বাঙাল দেশের জমির মত ফসল লেগেই আছে। হয়তো আমন ধান কিংবা হয়তো আউশ ধান কিংবা হয়তো চোত ফসল। চাষীর ফসলের অভাব নেই। ক্ষেতে খাটতে পারলেই হরেক রকম ফসল ফলে। শীতে একরকম, বসন্তে আর একরকম। কর্পূর কারখানাতেও ঋতুর পরিবর্তন হয় আর এক এক রকম অসুখের মরসুম লাগে।

বর্ষা শেষ হয়ে শরৎকাল এগিয়ে আসে। আকাশ থেকে খোলাখুলি জল না পড়ে হিম পড়ে গুড়ি গুড়ি। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় পুজোর আসর শেষ হয়ে আসে কিন্তু ছেলেরা আনন্দকে আঁকড়ে ধরতে চায়। মা দুর্গার সঙ্গে তো আর আনন্দকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। তাই পার্কে পার্কে আবার প্যাণ্ডেল হয়। গান বাজনা হয়। নাচ হয়। ছেলেরা সারা রাত জেগে শোনে। বড় বড় গুণীরা আসেন। বাঙালী রবিশঙ্কর আসেন। লাহোর থেকে বড়ে গোলাম আলি আসেন। এমনি করে সারা ভারতের গুণীরা এসে জড়ো হন কলকাতায়। প্যাণ্ডেলের মাঝখানে আসর বসে। সামনে ঘিরে একশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়া শ্রোতারা বসেন আস্তে আস্তে। দক্ষিণার পরিমাণও যেমনি কমে দূরত্বও তেমনি বাড়ে। প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়ায় যারা তারা হয়তো টিকিট পায়নি কিংবা হয়তো টিকিট করতে চায়নি। পানের দোকানের নীচে বসে সারা রাত হয়তো ঝিমোয় কলেজের ছাত্র। ফুটপাথের পাশে গাড়ি লাগিয়ে রাত জেগে হয়তো গান শোনেন উচ্চ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আর তাদেরই মাঝে বিনি পয়সার আনন্দের ভোজে আরও অনেকে যোগ দেয়। পুজো বাড়ির রবাহুত কাঙালীদের মত গাড়ির ভিতরে বসে সতু বস্তি ঝিমোয়, বস্তিগিন্নী ঝিমোয়। খুব সাবধানে গাড়ির ভিতরের আলোটা নিবিয়ে দেয়। বাইরে ভারতীয় সুরের ঐতিহ্যে হেমন্তের রাতের আকাশ গম গম করে আর সতু বস্তির চেনা চোখ হয়তো বড়ে মিঞার দাড়ি দেখে চমকে ওঠে। সতু বস্তি

নিজেকে লুকোতে পারে, গাড়ির আলো নেবাতে পারে কিন্তু গাড়ি কি করে লুকোবে। ডাক্তার সাহেবের গাড়ি তো চেনা। তাইতে কলিমুদ্দিন ঠিক ডাক্তার সাহেবকে চিনে বার করেছে। আর সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়েছে।

সতু বক্সি ভয়ে আঁতকে ওঠে। আবার বুঝি ফিদা হোসেনের পেট পুড়েছে কি শালিকরামের টাইফয়েড হয়েছে। এমন আসর ছেড়ে সতু বক্সিকে এখন দৌড়তে হবে।

সতু বক্সির গাড়ি চিনতে পেরে কলিমুদ্দিন এক গাল হাসি হাসে। সাদা কালো দাড়ি, তামাটে ঠোঁট, সাদা দাঁত আর লাল মাড়ি। রাস্তার আলোতে রঙের যেন ঢেউ খেলে যায়। না, কলিমুদ্দিন সতু বক্সিকে ডাকতে আসেনি, গান শুনতে এসেছে। সারা হিন্দুস্থান থেকে সব বড় বড় ওস্তাদ এসেছে তাইতে কলিমুদ্দিনও এসেছে। আর কে এসেছে? আরও অনেকে এসেছে—ফিদা এসেছে, হামিদ এসেছে, মজিদ এসেছে, শালিকরাম এসেছে আর—।

বড়ে মিঞা কলিমুদ্দিন হঠাৎ থেমে যায়—আকর্ণ বিস্তৃত হাসিটাও কেমন যেন চুপ্‌সে যায়। কথাটা কলিমুদ্দিন এড়িয়ে যায়। বরং পালটা প্রশ্ন করে, ডাক্তার সাহেব কতক্ষণ থাকবেন।

ডাক্তার সাহেব সারারাতই থাকবেন। গান বাজনা ভালো লাগলে শুনবেন না লাগলে ঘুমুবেন। গাড়ির পেছনের সিটে পা-টা বেশ করে ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবেন।

আস্তে আস্তে কলিমুদ্দিন ভিড়ের ভিতরে মিলিয়ে যায়। রাত ক্রমে গভীর হয়। হিমের ভিতর দিয়ে মেটে মেটে জ্যোৎস্না উঁকি দেয়। ট্রামের তারের সুর আর রিক্সার ঠুং ঠুং-এর সঙ্গত থেমে যায়। আর রাতের নিস্তব্ধতা মথিত করে গম্ভীর পুরুষ গলায় অজানা সুর যেন মহা ওঙ্কারের মত ধ্বনিত হতে থাকে। সতু বক্সির ডাক্তারী, শালিকরাম আর কলিমুদ্দিন, টাকা পয়সার হিসাব আর চিকিৎসা শাস্ত্র সব যেন অবাস্তব হয়ে মিলিয়ে গেছে। বাস্তব শুধু নাদ মন্ত্রের মত মাইকের ভিতর দিয়ে আসা পুরুষ কণ্ঠ।

সামনে—চোখের সামনে যে দৃশ্যটা সতু বক্সির পড়েছিল সেটা যদি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত না হত তাহলে সতু বক্সির এ ঘোর ভাঙত না। সতু বক্সি কেন কারো হয়তো ভাঙত না।

উল্টো দিকের ফুটপাথে এক ভদ্রলোকের বাড়ি। সিঁড়ির ওপরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা দুটো মূর্তি বসেছিল। চারদিকেই চাদর মুড়ি দেওয়া

মূর্তির সেদিন অভাব ছিল না। তাইতে ঐ মূর্তির দিকে সতু বক্সির লক্ষ্য পড়েনি। কিন্তু গান শেষ হতেই মূর্তি ছুটো উঠে দাঁড়াল। চাদরগুলো একটু নড়ে উঠল। তারপর সতু বক্সি বুঝতে পারলো—আরে এ তো জসি-মুদ্দিন। আর সঙ্গে চাদর মুড়ি দেয়া একটা নারী মূর্তি। পোশাকের ধরন দেখে মনে হয় নারী। মূর্তি দক্ষিণ কলকাতার সাধারণ মেয়েদেরই মত। আর দূর থেকে দেখে বোঝা যায় যে বয়সের ছাপ যথেষ্ট আছে। মাঝ রাতের মিটমিটে আলোয় অতদূর থেকে এর চাইতে বেশী আর কিছু বোঝা যায় না। নারী মূর্তিকে জসিমুদ্দিনের সঙ্গিনী বলেই মনে হয়। দক্ষিণ কলকাতার ছেলেরা তাদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে যে ভাবে রাস্তায় চলে আর তাদের সঙ্গিনীরা তাদের সঙ্গে যে ভাবে রাস্তায় চলে ওদের চলনও অনেকটা সেই রকমই। হাসিমুখে সতু বক্সি ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আস্তে আস্তে ওরা মিলিয়ে যায়।

ওরা মিলিয়ে যাবার পরে নিজের মনের ভিতর তাকিয়ে সতু বক্সি শিউরে ওঠে। এমন চাঁদের আলোয় ভরা হিমের রাত, মন্ত্রের মত এমন গান, রাস্তা দিয়ে কিন্নর মিথুনের মত ছেলেমেয়েদের চলাফেরা তার ভিতরে কিনা সতু বক্সি ভাবছে জসিমুদ্দিনের গলার গ্ল্যাণ্ডের কথা, ভাবছে জসিমুদ্দিনের বুড়ী মায়ের কথা—যে স্রেফ দানাপানির জন্যে পরের বাড়ি বাঁদীগিরি করে। সেখানে শুধু শ্রম বিক্রি করলেই হয় না ইজ্জতও বিক্রি করতে হয়। সতু বক্সির হৈমন্তী রাত জসিমুদ্দিন বিষিয়ে দিয়ে গেল।

রাতটা হয়তো বিষিয়েই থাকতো যদি না শেষ রাতে ভোর হওয়ার আগ থেকে সেতারের মিঠে আওয়াজ শুরু হত। দিন শেষ হয়ে যেখানে রাত হয় আর রাত শেষ হয়ে যেখানে দিন হয় সেই সব সময়ে উন্মুখ মন কি ভবিষ্যতের জন্যেই উন্মুখ? সতু বক্সির পক্ষে বলা-শক্ত। তবে সেই সময়ে ভালো সুরে যদি আকাশ মুখর হয়ে ওঠে তাহলে মন যেন কিসের আশায় আরও উন্মুখ হয়ে থাকে। তাইতে সতু বক্সির মনের সব তিক্ততাই মিলিয়ে গিয়েছিল ভোরের আলোর সাথে সাথে সেতারের সুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

আর সেই ভোরের আবহাওয়ার সঙ্গে যেন খাপ খাওয়ানোর জন্যেই কলি-মুদ্দিনের হাসিটা সৃষ্টি হয়েছে। সেই কাঁচাপাকা দাড়ির সাদা কালো রঙ সেই ঠোঁটের তামাটে রঙ, দাঁতের আর মাড়ির সাদা আর লাল রঙ কলিমুদ্দিনের আকর্ণ বিস্তৃত হাসিকে যেন রঙে রঙে রাঙিয়ে দেয়।

সতু বক্সিকে অভিবাদন করে কলিমুদ্দিন, ডাক্তার সাহেবের কিরকম লাগলো?

'বড়ে মিঞার কি রকম লাগলো ?' সতু বদ্যি পাল্টা প্রশ্ন করে।

'চমৎকার লেগেছে।' বড়ে মিঞার হাসিতে আবার রামধনু খেলে যায়।

অপস্রিয়মান কলিমুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে সতু বদ্যি স্বগতোক্তি করে। কালকে কলিমুদ্দিন কেন থেমে গিয়েছিল সতু বদ্যি বুঝতে পেরেছে। সপ্রশ্ন চোখে কলিমুদ্দিন ফিরে দাঁড়ায়।

সতু বদ্যি প্রশ্নের উত্তর দেয়, জসিমুদ্দিনকে সতু বদ্যি দেখেছে। কাল রাত্তিরে একটি মেয়েলোকের সাথে ওপাশের ফুটপাথে সিঁড়ির ওপরে বসেছিল।

কলিমুদ্দিনের মুখটা চুপসে যায়। আটটার সময়ে কারখানায় যেতে হবে বলে কলিমুদ্দিন কি যেন বিড বিড করে বলতে বলতে রওনা হয়। সতু বদ্যি খালি দু-একটা কথা বুঝতে পারে। বে-ওকুফ, কম্‌বক্ত , বে-সরম ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্পূর কারখানা যেন সতু বদ্যিকে জড়িয়ে জড়িয়ে আছে, কিছুতেই ছাড়বে না। না ডাক্তারখানায় না বাড়িতে। রুগীর বস্তিতেও নয়, গানের আসরেও নয়। গ্রীষ্মকালে হয়তো টাইফয়েড, বর্ষায় হয়তো পেট পোড়া। সতু বদ্যি ভেবেছিল হেমন্তে বোধ হয় গানের ওপর দিয়েই যাবে। কিন্তু তাই কি আর যায়। গানের আসর তো শুরু। তারপর একসঙ্গে আসে যোল-সতেরজন সর্দি, কাশি, আর জ্বর নিয়ে। তার ভিতরে কলিমুদ্দিনও আছে, মজিদও আছে, হামিদও আছে, রমজানও আছে। সতু বদ্যি সবারই চিকিৎসা করে। বোতল ভর্তি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ওষুধ থাকে। ঢেলে ঢেলে সবাইকেই দেয়। কিছু লোকের সারে, কিছু লোকের সারে না। না সারার ভেতরে সাত-আটজন। তাদের আবার পেনিসিলিন দেয়া হয়, ওষুধ পাল্টে দেয়া হয়। তবে তাদের ভিতরে রোগী টিকে যায় আরও চারজন। তাদের আর কাশি সারে না, জ্বরও ছাড়ে না। তারা হল কলিমুদ্দিন, মজিদ, হামিদ আর রমজান।

এক সপ্তাহ পরে কলিমুদ্দিন এসে প্রশ্ন করে, তার কাশির কি হবে। কথার ধাক্কায় সতু বদ্যি পিছিয়ে যায়। না, ঠিক কথার ধাক্কায় নয় গন্ধে। কলিমুদ্দিনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে পচা গন্ধ বেরুচ্ছে। কথা বললে সে গন্ধ আরও জোরে বেরোয়। সারা ঘর ভর্তি হয়ে যায় পূতিগন্ধে। অনেক দিনের—প্রায় এক যুগ আগেকার স্মৃতি যেন বয়ে নিয়ে আসে এই গন্ধ।

ছাত্রাবস্থার কথা সতু বদ্যির চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। অধ্যাপক ডাক্তার বোস হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়েন। তার পিছনে—মাছের পিছমে পোনার মত—এক ঝাঁক ছাত্র চলছিল। তারাও

থেমে পড়ে। নাকের ফুটো দুটো একটু বড় করে টেনে টেনে শ্বাস নিতে নিতে ডাক্তার বোস ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেন, গন্ধ পাচ্ছ, গন্ধ? ছাত্রেরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে, উত্তর দেয় না। ডাক্তার বোস আবার প্রশ্ন করেন, একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছ না তোমরা? এবার সব ছাত্রই বলে, হ্যাঁ পেয়েছি। কলিমুদ্দিনের কথায়ও সেই গন্ধ।

আরও মনে পড়ে ডাক্তার বোসের বক্তৃতা: এই যে পচা গন্ধ, এই যে কাশি, এই যে দুর্গন্ধময় গয়ার, এই যে বিছানায় শয়নশৈলি পরিবর্তনে কাশির গুণগত পরিবর্তন এ তোমরা পাবে ফুসফুসের ফোড়ায়—এ তোমরা পাবে ব্রঙ্কিয়া-কটেসিসএ............।

কলিমুদ্দিনের বেশ জ্বরও হয়েছে। হয়তো ফুসফুসে ফোড়াই হয়েছে। এক্সরের জন্যে হুকুম যায়।

ফেপড়াকা তসবির? কলিমুদ্দিন প্রশ্ন করে যায়। তসবিরই যদি খিঁচতে হয় তা হলে তো হামিদেরও খিঁচতে হয়, মজিদেরও খিঁচতে হয়, রমজানেরও খিঁচতে হয়। ওদেরও তো কাশি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে। কিছু লোক পৃথিবীতে জন্মায় যারা জন্মগত বড়ে মিঞা কিংবা বড়দা। তাদের নিজের অবস্থা যেমনই হোক —মাতব্বরি না করে পারে না। এ দেখুন না কলিমুদ্দিনকে। তাকে কে দেখে ঠিক নেই সে এখন শঙ্করাকে ডাকবে। কিন্তু সতু বদ্যি করবেই বা কি? ডাক্তার হিসাবে তো বড়ে মিঞার প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু নেই।

সুতরাং চারজনের এক্সরে হয় একসঙ্গে। আর রিপোর্ট যা আসে তাতে সতু বদ্যির চক্ষু কর্ণে যেন মধু বর্ষণ করে। রমজান, হামিদ আর মজিদের ফেপড়ায় টি-বি-কা সিকায়েৎ আর বড়ে মিঞার ফেপড়ায় ফোড়া—বেশ বড় একটি প্রমাণ হাঁসের ডিম সাইজের ফোড়া।

এইবার সমস্যাটি বুঝুন। একজনের যদি অসুখ করে তাহলে সবাই মিলে চাঁদা তুলে তার চিকিৎসা করা যায়। কর্পূর কারখানা সেটা করে। কিন্তু এখানে অসুখ করেছে তিনজনের আর এই তিনজনের জন্যে যে চাঁদা তুলবে সেই মুখিয়া বড়ে মিঞা কলিমুদ্দিনেরও। মহাবীর বালিপুত্র অঙ্গদের ভাষায় 'মাথায় সর্প দংশিলরে বাঁধবি কোথায় তাগা।' মাথায় হাত দিয়ে সতু বদ্যি এই সমস্যাই ভাবে।

সতু বদ্যির বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা করার কোন ক্ষমতাই নেই এখানে। টাকা কোথায়? তবে অনেককাল আগে সতু বদ্যির কোন পূর্বপুরুষ যিনি হোমিও-

প্যাথি করতেন তাঁর মত ক্ষমতা যদি সতু বদ্যির থাকতো তা হলে কিছু হয়তো করতে পারতো। তাঁর কি রকম ক্ষমতা ছিল জানেন ?

গড়ের মাঠ পেরিয়ে গঙ্গার ধারে একটি গর্তে একটি শেয়াল আর শেয়ালনী থাকতো।

একদিন বড়দিনের সময় শেয়াল হন্ হন্ করে মাঠ পেরিয়ে আসছে হগ সাহেবের বাজারে বাজার করতে। মাঠের পাশ দিয়ে ট্রামটা চলছিল খুব জোরে—শেয়াল দেখতে পায়নি ভালো করে। যখন দেখলো তখন শেয়াল কোন রকমে লাফিয়ে বেঁচে গেল বটে কিন্তু তার লেজটি কাটা পড়লো। কাটা লেজ মুখে নিয়ে শেয়াল মনের দুঃখে সারা কলকাতা শহর ঘুরলো।

ফিজিসিয়ানের কাছে গেলে তিনি পাঠান সার্জনের কাছে। সার্জন বলেন, হয়তো রবারের লেজ লাগিয়ে দিতে পারেন কিন্তু ও লেজ আর জোড়া যাবে না। শেয়াল আর কি করে, শেয়ালনীর পরামর্শ নিতে গেল। শেয়ালনী প্রশ্ন করল, রবারের লেজ তো হল কিন্তু সে লেজ কি নাড়া যাবে। সার্জন বল্‌লো, 'না এ লেজ নাড়া যাবে না।' সুতরাং শেয়ালনীর সার্জনও পছন্দ নয়। লেজ যদি নাড়াই না গেল তো সে লেজ দিয়ে হবে কি। লেজ নাড়তে পারে বলেই না শেয়ালপণ্ডিত। এই ভাবে কবরেজ-হেকিম সব ঘুরে সতু বদ্যির পূর্বপুরুষ সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে এসে হাজির হল। তিনি প্রথমে অনেক দরকারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। লেজটা ডান দিক দিয়ে কেটেছিল না বাঁদিক দিয়ে কেটেছিল। তখন শেয়াল কি ভাবছিল। শেয়ালের বাপ-ঠাকুর্দা কি খেত, কোথায় থাকত। শেয়ালনী ঝগড়া করে নাকি, ইত্যাদি সব জিজ্ঞাসা করে দুটি ফোঁটা ওষুধ বার করলেন।

একটি ফোঁটা ওষুধ লাগিয়ে দিলেন যেখান থেকে লেজটি কেটেছে সেখানে। দেখতে দেখতে একটি লেজ গজিয়ে উঠলো।

তারপরেই আর এক ফোঁটা ওষুধ দিলেন ঐ কাটা লেজের ওপর। দেখতে দেখতে একটি শেয়াল গজিয়ে গেল।

একটা শেয়ালের বদলে দুটো শেয়াল নিয়ে শেয়ালনী কি করেছিল তা অবিশ্যি সতু বদ্যির জানা নেই কিন্তু ঐরকম ওষুধ পেলে সতু বদ্যির যে কি সুবিধা হত তা সে হাড়ে হাড়ে জানে। জসিমুদ্দিনের ফুসফুসের ফোড়া আর হামিদ মজিদ রমজানের ফেপড়াতে টিবি কা সিকায়েৎ—এ সবের চিকিৎসা সতু বদ্যি কি করে করবে !

চিকিৎসা করতে হবে তাও কিন্তু তারা বলেনি। সারিয়ে দিতে হবে তাও বলেনি। আর্থিক পরমার্থিক সব দায়িত্ব যে সতু বদ্যির সে কথাও বড়ে মিঞা কখনো বলেনি। হয়তো শুধু শালিকরাম যখন নেপথলিনের বল প্যাক করতে গিয়ে হাত কেটে ফেলেছে তখন সতু বদ্যির কাছে হাত সেলাই করতে এসে অনেক কথার ভিতর বলেছে বড়ে মিঞার ভারি অসুখ করেছে। কিন্তু কর্পূর কারখানার লোক তাতে ভয় পায় না। হয়তো তারা জানে সতু বদ্যি আছে ভয় কি ?

ফিদা হোসেনের হয়তো পেচিসকা সিকায়েৎ হয়—সতু বদ্যির কাছে ওষুধ নিতে এসে সে অনেক কথা বলে। তার ভিতরে এও বলে যে আসমানে যতক্ষণ খোদা আছে আর জমিনে যতক্ষণ ডাক্তার সাহেব আছে ততক্ষণ কর্পূর কারখানার লোক মরণকে ভয় পায় না।

এত দায়িত্বের ভারে সতু বদ্যির আড়াই মন ওজনের দেহ, পাকা বাঁশের মত হাড় সব যেন নুইয়ে পড়ে।

তার ওপরে আবার গোদের ওপর বিষ ফোড়া বাধিয়ে তুললো কলিমুদ্দিন। কলিমুদ্দিনের বিবি তাকে দেশে কে খবর দিয়ে দিল তার মরদের ভারি মরজ। উল্টাপুল্টা দম চলছে সুতরাং সে পায়ের রূপোর মল বেচে দিল। গলার হাঁসুলি বেচে দিল, মায় কানে একটা সোনার দুল ছিল তাও বেচে দিল—তার পর কলকাতায় চলে এল। এসেছিস তো বেশ করেছিস। কর্পূর কারখানার সামনে খাসা বস্তি রয়েছে সেখানে থাক্ না। স্বামী সেবা কর পরকালে স্বর্গে যাবি তা না সতু বদ্যিকে এসে ডাক্তারখানা অবধি তাড়া করা।

আপনারা হয়তো বলবেন এত লোকই তো ডাক্তারখানায় আসে কলিমুদ্দিনের বিবি না হয় এসেছে তাতেই বা এত রাগ কেন ? কলিমুদ্দিনের বিবি মেয়ে লোক না পুরুষ তা সতু বদ্যির পক্ষে বোঝা শক্ত। আপাদমস্তক একটা পুরনো ছেঁড়া নোংরা বোরখায় ঢেকে এসেছে আর শুধু কি তাই বোরখার দুর্গন্ধে কাছে বসা যায় না। তার নাম হল কি না আতর বিবি। অবিশ্যি ওদের কাণ্ডই এরকম। বাড়িতে হয়তো একটি টিনের কৌটোও নেই নাম দিয়ে বসলো হয়তো দেদার বক্স।

আর ঐ পুঁটলিটা এনে সতু বদ্যির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলো। বসে পায়ের কাছে একটি রুমাল বিছিয়ে দিল, দিয়ে নানারকম ফোঁস ফোঁস আও-য়াজ করলো। গা থেকে খুলে রূপোর গয়না রাখল, গুচ্ছের টাকা পয়সা

রাখলো তারপর খানদানি উর্দু আর দেহাতী হিন্দী সব মিলিয়ে যা বললো তার মর্মার্থ হল বড়ে মিঞা অর্থাৎ কলিমুদ্দিন সতু বদ্যির জিম্মা। বোরখার ভিতর দিয়ে চোখ দেখা যায় না সুতরাং চোখ দিয়ে জল পড়ছে কি না পড়ছে বলা শক্ত আর কথাও অর্ধেক বোঝা যায় না সুতরাং কি বলছে তাও পুরোপুরি বলা শক্ত। তা সত্ত্বেও সতু বদ্যি ভয় পায়। মেয়েমানুষ দেখলেই সতু বদ্যি ভয় পায়। ওরা ভারি গোলমেলে জাত। বাইবেলে নাকি বলেছে পুরুষের পাঁজরের একখানা হাড় দিয়ে স্ত্রীজাতির সৃষ্টি তবে এসম্বন্ধে সতু বদ্যির দ্বিমত আছে। সতু বদ্যির ধারণা মেয়েদের শরীরে হাড়ই নেই। শুধু হাড় কেন অস্থি, মেদ, মজ্জা, রক্ত, মাংস কিছুই নেই—আছে শুধু চামড়ায় ঢাকা পেঁচানো পেঁচানো ইলেকট্রিক তারের মত স্নায়ু (nerve), কোথায় ছুঁলে যে কখন শক মারবে বলা ভারি শক্ত। আর বলুন তো কলিমুদ্দিন কিনা আস্তো একটা মেয়েমানুষই লেলিয়ে দিল। এই জন্যেই বলেছে যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।

যাই হোক কোন রকমে নসিব কোশিশ ইত্যাদি ভালো ভালো রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করে কলিমুদ্দিনের বিবিকে সতু বদ্যি বিদেয় করে কিন্তু তাইতে কি রক্ষে আছে। এবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন খোদ জসিমুদ্দিন।

হারামজাদ, ইবলিশের বাচ্চা, বে-সরম জসিমুদ্দিন এতদিন রঙ্গমঞ্চের পিছনেই ছিল। একবার শুধু দেখা হয়েছিল সেও রাতের অন্ধকারে গান শোনার সময়। দিনকাল যখন খারাপ হয় কাটা শোল মাছও লাফিয়ে জলের ভিতরে চলে যায়। সুতরাং জসিমুদ্দিন যে আবির্ভূত হবে তা আর বিচিত্র কি? তবে বিচিত্র হল সঙ্গে আমদানী একটি মেয়েছেলে। আবার ঐ মেয়েছেলে?

মেয়েলোকটির চেহারা দেখেই সতু বদ্যি বুঝতে পারে জসিমুদ্দিনের 'মা' হবে বোধ হয়। বেশ কালো রঙ, বছর চল্লিশেক বয়স, রোগা মত খেটে খাওয়া চেহারা। মাথার চুলগুলো আধপাকা আধকাঁচা। গভীর ভাবে পানের ছোপ লাগা থাকলেও দাঁত অর্ধেকও নেই আর ঘোমটা কিংবা বোরখার বাহার নেই। চোরের মত মেঝের এক কোণে বসেছিল মেয়েলোকটি। গ্রামের মেয়েলোক তো চেয়ারে বসতে সাহস পায় না।

প্রথমে ঘরে ঢুকে জসিমুদ্দিন রুগীদের বসবার টুলে বসে না। সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার কোনাটা ছুঁয়ে চোরের মত মাথা নীচু করে থাকে। সতু বদ্যির ডাক্তারখানায় ভিড় খুব। তাইতে এমনিতেই কোন রুগীর পিছনে

অনর্থক সময় ব্যয় করা সম্ভব নয়। সতু বদ্যি তাই কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'কি হয়েছে জলদি বাতলাও।'

ছোকরা কথা না বলে মাথা নীচু করে থাকে। ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বাঁধানো মেজেটা খুঁড়তে চেষ্টা করে।

সতু বদ্যি কাঁহাতক একা একা জসিমুদ্দিনের সঙ্গে এক ঘরে সময় কাটাবে। না, ইবলিশের বাচ্চা বলে ভয়ে নয়, ঘাড়ে একটা শয়তান চেপে বসবে সে ভয়েও নয় কচ্ছপের বর্মের মত শক্ত গায়ের চামড়া হওয়া সত্ত্বেও জসিমুদ্দিনের সামনে সতু বদ্যির গাটা ঘিন-ঘিন করে ওঠে। সতু বদ্যি আর একটা ধমক লাগায়, ও যদি তাড়াতাড়ি বলে তো বলুক না হয় বেরিয়ে যাক্, দরজা খোলা আছে।

দরজা খোলা আছে শুনে জসিমুদ্দিন পিছনে তাকায়, আস্তে আস্তে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপরে চোরের মত মিনমিনে গলায় তার আসবার কারণ বলে, 'পিসাব কারাস্তাসে মুয়াত নিকালতা।'

সতু বদ্যি সোজা হয়ে বসে। জাত বদ্যির মাথায় চট্ করে বুদ্ধি খুলে যায়। জসিমুদ্দিন একটা কাঁটা। সমাজের সুস্থ দেহে একটি কাঁটা বিশেষ। আর কলিমুদ্দিনের বুকে হয়েছে আর একটা কাঁটা। এই জসিমুদ্দিনকে দিয়ে কলিমুদ্দিনের বুকের কাঁটা উৎপাটন করতে হবে। জসিমুদ্দিনের যৌনব্যধি হয়েছে। কৈশোর ছাড়িয়ে এখনও যৌবনে পা দেয়নি কিন্তু জাহান্নমের রাস্তায় বেশ ভালো করেই এগিয়েছে। তার ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। চারদিকের আলো কলিমুদ্দিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও জসিমুদ্দিন নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছে। তার ফলে তার ভবিষ্যৎ হয়েছে আরও অন্ধকারময়। সুতরাং তাকে যদি সামান্য আর্থিক শোষণ করে সেই টাকায় কলিমুদ্দিনের চিকিৎসার কিছু সুরাহা করা যায় তাহলে নৈতিক ভাবে কোন দোষ হয় না। বরং তাতে সতু বদ্যির নিজেকে ক্ষুদে রবিনহুড বলেই মনে হবে।

তাইতে সে জসিমুদ্দিনকে ভয় দেখায়—তার যে অসুখ হয়েছে তার নাম সুজাক। খুব খারাপ অসুখ—এতে মানুষ মরে যায়। সুজাক আর গর্মি থেকে হতে পারে না এমন কষ্ট নেই। এ থেকে মানুষ অন্ধ হতে পারে, খঞ্জ হতে পারে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে। বাতগ্রস্ত হতে পারে। পাগল হতে পারে। পুরো খানদান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে এ অসুখ সতু বদ্যি সারিয়ে দিতে পারে। পুরো কর্পূর কারখানার লোক জানে ইমানদার ডাক্তার যদি শহরে কেউ থাকে তবে সতু বদ্যিই আছে। সেই ইমানের

কথা মনে রেখেই সতু বদ্যি বলছে যে সে এই মরজের জড় ছাড়িয়ে দেবে কিন্তু চিকিৎসার জন্যে ষাট টাকা লাগবে আর সে টাকাটা আগাম দিতে হবে।

জসিমুদ্দিন অনেক কান্নাকাটি করে তবু সতু বদ্যি এক পয়সা কমায় না। এমন কি একটা ইনজেকশানও দেয় না। আগে টাকা দেবে তারপরে চিকিৎসা শুরু হবে।

দুটো পা ফাঁক করে থপ্ থপ্ করে হেঁটে ঘরের বাইরে যেতে যেতে জসিমুদ্দিন বলে, আচ্ছা টাকা ও এনে দেবে। এক ঘণ্টার ভিতরেই এনে দেবে কিন্তু বাইরে যে জেনানা বসে আছে তার ইলাজের বন্দোবস্ত তো সতু বদ্যি করুক, তাকে পরীক্ষা করুক। ইতিমধ্যে টাকা ও এনে দিচ্ছে।

সতু বদ্যি প্রশ্ন করে 'ওকি তোমার মা?'

সতু বদ্যির মনের ভিতরে চিন্তা খেলে যায়। মা একটা অদ্ভুত জিনিস। এত পাপ এত অন্যায় সব সত্ত্বেও জসিমুদ্দিনের যৌনব্যাধির চিকিৎসার জন্যে তার মা এসে বসে আছে। ভাবতে পারেন! নিজের তাগদ, নিজের ইজ্জত সব বেচে যে-ছেলেকে মানুষ করলো সে-ই ছেলে বেইমানী করেছে কিন্তু মা তো তাকে ত্যাগ করেনি।

ইংরেজি উপন্যাসে পড়া চীনে গল্প সতু বদ্যির মনে পড়ে যায়। দুঃখিনী মায়ের একমাত্র ছেলেকে মা প্রায় বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছিলেন। পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি থেকে শুরু করে এমন কাজ নেই যা করেননি। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছেলে মানুষ হবে। সেই ছেলে যখন সাবালক হল তখন গিয়ে পড়লো এক শয়তানী মেয়েমানুষের ফাঁদে। সে মেয়েমানুষ আর কিছুতেই ছেলের কাছে ধরা দেয় না। তখন একদিন ছেলে জিজ্ঞেস করলো 'কি হলে তুমি আমার কাছে ধরা দেবে?' মেয়েমানুষটা তার দাম বললো : ছেলেটি যদি তার গর্ভধারিণী দুঃখিনী মাকে হত্যা করে তার হৃৎপিণ্ড মেয়েমানুষটিকে উপহার দিতে পারে তাহলে সেই মেয়েমানুষ বুঝবে ছেলেটির ভালবাসার গভীরতা। তাহলেই সে ধরা দেবে। গভীর রাতে ভালবাসার উন্মাদনায় ছেলেটি নিজের হাতে তার মাকে হত্যা করলো, হত্যা করে তার হৃৎপিণ্ড কেটে বার করলো।

নিশীথ রাতে একটা পাতায় মোড়া মায়ের হৃৎপিণ্ড নিয়ে ছুটতে ছুটতে সন্তান চলেছে তার প্রেমিকার কাছে—আজ রাত্রে তার প্রেমিকা তার কাছে আত্মদান করবে। হঠাৎ পা ফসকে হোঁচট খেয়ে ছেলেটা পড়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা

হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। কোন রকমে সামলে উঠে যখন ছেলেটা আবার হৃৎপিণ্ডটা কুড়িয়ে নিয়েছে তখন শোনে নিস্তব্ধ নিশীথ রাতে তার মায়ের হৃৎপিণ্ড ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলছে। কানের কাছে হৃৎপিণ্ডটা ধরে ছেলেটি শুনলো তার মায়ের হৃদয় বলছে 'খোকা পড়ে গিয়ে তোর খুব ব্যথা লেগেছে ?'

এই সেই মা।

না, মা নয়। জসিমুদ্দিন ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলে যায়, ঐ মেয়েলোকটি তার পিয়ারী।

বাইরের ঘরে বেরিয়ে এসে একবার জসিমুদ্দিন আর একবার মেয়েলোকটির দিকে তাকিয়ে সতু বদ্যি বোকা বনে যায়।

যাই হোক, মেয়েলোকটিকেও সতু বদ্যি প্রশ্ন করে, পরীক্ষা করে। তার কোমরে হাঁটুতে, গোড়ালিতে, হাতে সর্বত্র গিঁটে গিঁটে ব্যথা। তার পেশা নিম্ন শ্রেণীর দেহব্যবসায়। তার রূপ নেই, কখনও ছিল না বলে। যৌবন নেই, বিক্রি হয়ে গেছে বলে। আছে শুধু দেহ। সেই দেহের সে ব্যবসা করে। জসিমুদ্দিন তার খরিদ্দার। এরকম আরও কিছু কিছু অল্পবয়সী অনভিজ্ঞ লোকেরা নেহাতই কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে তার কাছে আসে।

রোগ নির্ণয়ে সতু বদ্যির অসুবিধা হয় না। যৌনব্যাধি-জনিত বাত রোগ। এর চিকিৎসা করা মানে যৌনব্যাধি সারানো। কিন্তু যতই চিকিৎসা করা যাক দেহব্যবসায়ীর কি যৌনব্যাধি সারানো যায় ?

এ কেবল দিবা রাত্রে
জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবার।

তবে সতু বদ্যি মেয়েলোকটির চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়। অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ দাক্ষিণ্যও দেখায় না আবার কোন অত্যাচারও করে না। আর শুধু তাই নয় অনর্থক হলেও উপদেশ দেয় দেহব্যবসা ত্যাগ করতে। দেহব্যবসা ত্যাগ না করলে এ রোগের সুরাহা হবার কোন আশা নেই। ত্যাগ করুক আর না করুক চিকিৎসার দায়িত্ব সতু বদ্যি গ্রহণ করে।

জসিমুদ্দিন ফিরে আসে খুব তাড়াতাড়ি। রিক্সা করেই ফিরে আসে, ষাটখানি এক টাকার করকরে নোট নিয়ে আসে। পেনিসিলিন আর অ্যালালি মিকশ্চারের জন্যে সতু বদ্যির খরচ বড় জোর দু- টাকা। বাকী

আটান্ন টাকাই লাভ।

সুতরাং কলিমুদ্দিনের চিকিৎসার ভার অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। সাঙ্কো-পাঞ্জা কলিমুদ্দিনকে দু-বেলা পেনিসিলিন দেয়। স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেয়। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

আর আরেকটা ভারও হাল্কা হয়। রমজান অসুখের কথা শুনে পালিয়ে যায় দেশে। ফেপড়ায় টিবিকা সিকায়েৎ ছিল তিনজনের। তার ভিতরে একটি গেল দেশে চলে—রইল বাকী দুই।

এই দুয়ের জন্যে কলিমুদ্দিনের যা প্রচেষ্টা তা ভোলা সতু বস্তির পক্ষে সত্যিই মুশকিল।

ফিদা হোসেন কলিমুদ্দিনকে দেখতে আসে। কলিমুদ্দিন সাফ সাফ বলে যে, সে তো মরে যাচ্ছে কিন্তু তার পেট পুড়ে গেলে তার জন্যে বড়ে মিঞা ও কর্পূর কারখানার অন্যান্য মজদুররা যা করেছিল সে ঋণ যদি শোধ করতে চায় তবে মজিদ আর হামিদকে বাঁচানোর জন্যে কোশিস করতে হবে।

শালিকরাম কলিমুদ্দিনকে দেখতে আসে। কলিমুদ্দিন বলে, শালিকরামের টাইফয়েডের ইলাজের ঋণ শালিকরাম যদি বাপিস্ করতে চায় তা হলে হামিদ আর মজিদকে বাঁচাতে হবে। শুধু তাই নয় আবদুল করিম খাঁ এসেছিল। সেই আবদুল করিম যার মুখের তালুর ভিতরে ফুটো হয়ে গিয়েছিল। মুখ দিয়ে জল খেলে নাক দিয়ে বেরিয়ে যেতো। সিফিলিস রোগ থেকে হয়েছিল। কলিমুদ্দিন তাকে ঘৃণা করেনি। ডাক্তার সাহেবের কাছে বারবার গিয়েছিল। ডাক্তার সাহেবকে বুঝিয়েছিল, আবদুল করিমের যদি গলৎ হয়ে থাকে বা তার বাবা, দাদা, পরদাদা আর নাগরদাদা তাদের কারো যদি গলৎ হয়ে থাকে তো তার নতিজা জিন্দিগীভর করিম খাঁ কেন ভোগ করবে? এখন তাকে সেই ঋণ শোধ করতে হবে হামিদ-মজিদকে বাঁচিয়ে। বড়ে মিঞার অসুখ করেছে তাই বলে কি মজিদ হামিদের জিম্মা কেউ নেবে না?

কলিমুদ্দিনের দাড়ি আর ঠোঁট, দাঁত আর মাড়িতে কত যে রঙ সতু বস্তি গুণে শেষ করতে পারে না।

তবে কথায় বলে—রাখে কেষ্ট মারে কে? কলিমুদ্দিন শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল বলে সতু বস্তি বলছে না। কলিমুদ্দিনের তো একমাস বাদে এক্সরে করে দেখা গেল ফুসফুসে ফোড়ার জায়গায় একটি দাগ মাত্র রয়েছে। এই

হল জাত বদ্যির খেল। কেবল তাই নয় তিনটি যক্ষা রুগীরও প্রায় একটা বিহিত সতু বদ্যি করে ফেললো। রমজান দেশে গিয়ে দেহ রক্ষা করলো। এ রোগের ডাক্তার সেখানে নেই। আর সে হল ভীতু। তাই ভয়ে কলকাতায় এল না—ওখানে মনের আনন্দে মওতকা দরওয়াজা পেরিয়ে গেল।

আর হামিদ ও মজিদকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন আর প্যাস, মাল্টিভিটামিন আর আইসোনিয়াজিড, পেটে হাওয়া দেয়া আর গলার স্নায়ুকর্তন—এই সব করে সতু বদ্যি কাজ প্রায় এগিয়ে আনে। সতু বদ্যির হাতে তাদের যক্ষা রোগ ক্রমশই পরাজয় স্বীকার করে। করবে না? যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। তবে এ ছাড়া অন্য সমস্যা হল, অর্থের আর ছুটির। খাদ্যের আর হাল্কা কাজের। ছুটি হলেই খাদ্যের অভাব হয় আবার ছুটি ফুরোলেই ভারি কাজ করলেই আবার যক্ষা রোগ বেড়ে যায়। কিন্তু কর্পূর কারখানার যত সমস্যাই হোক—সে অর্থই হোক আর ছুটিই হোক, হাল্কা কাজই হোক আর খাদ্যই হোক—বড়ে মিঞা পাশে থাকলে সতু বদ্যিও অনেক ভরসা পায়।

এইবারে একদিন সতু বদ্যি কলিমুদ্দিনকে বেশ জমিয়ে জসিমুদ্দিনের গল্প বলে। জসিমুদ্দিন আর বিগতযৌবনা প্রৌঢ়া পিয়ারীর। গল্প করার একটা উদ্দেশ্য ছিল। কলিমুদ্দিনকে জানিয়ে দেয়া দরকার টাকা দেয়ার ক্ষমতা জসিমুদ্দিনের আছে—তাছাড়া এক ঘণ্টার নোটিশে ষাট টাকা সে কোত্থেকে বার করলো। সতু বদ্যির মনে বোধ হয় একটা ক্ষীণ আশাও ছিল যে তার বহুকালের পুরনো তামাদি হয়ে যাওয়া একশ টাকার একটা হিল্লে হয়তো হলেও হতে পারে।

টাকার খবর কলিমুদ্দিন জানে। সতু বদ্যি তাকে কি শেখাবে? কলিমুদ্দিনের অসুখের মাসখানেক আগে মালিকের সঙ্গে কর্পূর করখানার কর্মীদের একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠেছিল। ফার্নেসে কাজ করার সময় চোখের আর সারাদেহের রক্ষা ব্যবস্থা যা হওয়া উচিত তা ছিল না। সেই ঝগড়ায় ক্ষুধার্ত কুকুরের মত মাসিক দশ টাকা মাইনে বাড়ার লোভে জসিমুদ্দিন মালিকের তরফে গিয়েছিল। এখনও সে মালিকের তরফেই আছে। তাইতে দরকার হলে মালিক টাকা দিতে কসুর করে না। সে খবর কি আর কলিমুদ্দিন জানে না। সতু বদ্যি যার কাছে মাসির গল্প করতে এসেছে।

কলিমুদ্দিনের মুখের দিকে তাকায় সতু বক্সি। অসুখের পরে বড়ে মিঞার একটু পরিবর্তন হয়েছে। এখনও চোখ দুটো আগের মতই মাঝে মাঝে ভিজে ওঠে কিন্তু আগের মত ঘৃণায় আর জ্বলে ওঠে না। অসুখের জন্যে কলিমুদ্দিন কি একটু নরম হয়ে গেল? একি শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে মানসিক যোগাযোগের ফল।

কর্পূর কারখানার সঙ্গে সতু বক্সি ক্রমশই জড়িয়ে পড়ে। শুধু কর্পূর কারখানাই বা কেন রেললাইন পেরিয়ে খোলা ড্রেন আর ইঁটের রাস্তা পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা আর ডোবার এলাকায় গিয়ে ঐ বস্তিগুলোর ভিতরে কর্পূর কারখানা আর গেট কোম্পানী। ব্যাটারীর কারখানা আর সাবানের কল। বস্তির পর বস্তি সর্বত্রই সতু বক্সির পসার বাড়ে।

'তোমার এই মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু?'

তেমনি ইমানদার কলিমুদ্দিনের ইলাজ করে সতু বক্সির মোটের ওপর লোকসান হয়নি। বড়ে মিঞা টাকা পয়সা দিতে পারেনি সে কথা খুব সত্যি। শালিকরাম চিড়িয়ার আণ্ডা নিয়ে তাড়া করেছিল। ফিদা হোসেন পোড়া পেট নিয়ে তাড়া করেছিল। করিম খাঁ ফুটো তালু নিয়ে তাড়া করেছিল। সতু বক্সি লড়েছিল, বড়ে মিঞাও লড়েছিল। কিন্তু বড়ে মিঞা চুপ করে থাকার ছেলে নয়। বস্তির পর বস্তি কারখানার পর কারখানা সতু বক্সির সুখ্যাতি করে বেড়িয়েছে।

জাত বক্সি ব্যবসায় ভুল করে না, পয়সাটি সে ঠিক চেনে।

তবে জসিমুদ্দিনের সঙ্গে দেখা আবার কপালে লেখা ছিল। শীত তখন শেষ হয়েছে বেশ গরম পড়েছে। পলাশের কাল শেষ হয়ে কৃষ্ণচূড়া শুরু হয়েছে। কলকাতার পার্ক আর রাস্তা কৃষ্ণচূড়ায় লালে লাল হয়ে আসছে। সতু বক্সি কত লাল দেখেছে? সন্ন্যাসীরা যখন মনের রঙে বসন রাঙায় সে রঙ সতু বক্সির ভালো লাগে আবার গৌরী তরুণীরা যখন রক্তাম্বরে তরুণদের আমন্ত্রণ জানায় সে রঙও সতু বক্সির ভালো লাগে। শল্যগৃহে যখন সাদা গজ রুগীর রক্তে লাল হয়ে আগামী আরোগ্য-সুখের সংবাদ ঘোষণা করে তখন সতু বক্সির ভালো লাগে। তেমনি ভালো লাগে আঁতুড় ঘরে নবজাত শিশুর দেহে লাল রঙের নবজীবনের ঘোষণা। আরও ভালো লাগে শিমুল আর পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া।

কিন্তু জসিমুদ্দিনের গলা দিয়ে যখন রক্ত পড়লো—অজস্র রক্ত, ফুসফুস

থেকে আসা বজবজে ফেনায় ভরা তাজা লাল আগুনের মত লাল রক্ত তখন সে লালে সতু বদ্যির যে আনন্দ হল সে আনন্দ সতু বদ্যির সচরাচর হয় না। নৈরাশ্যবাদী, নিরীশ্বর সতু বদ্যির সেই দিনের জন্যে মনে হল হয়তো এমন কোন অদৃশ্য শক্তি আছেন যিনি কোন না কোন দিন প্রত্যেক অন্যায়ের যোগ্য শাস্তি দান করেন। না, ঠিক চিত্রগুপ্তের হিসাবে সতু বদ্যি বিশ্বাস করেনি কিংবা রোজকিয়ামতের দিনে ইসরাইল শিঙ্গা ফুঁকে সব আত্মাদের ডেকে বিচার করবেন তাও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু একটা ন্যায়নিষ্ঠ অদৃশ্য শক্তির ওপরে বিশ্বাস করেছিল।

এই জসিমুদ্দিন তার মার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সতু বদ্যির একশ টাকা ফাঁকি দিয়েছে, কর্পূর কারখানার সরল উপকারী ঊনচল্লিশজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করে তাদের দুশমনের পক্ষে যোগ দিয়েছে। কী না করেছে ?

এখন সেই মালিক যখন দেখেছে জসিমুদ্দিনকে দিয়ে তার কাজ মিটে গেছে, অসুস্থ জসিমুদ্দিনের কাছ থেকে ভবিষ্যতেও কোন কাজের আশা নেই—তখন তাকে ছেঁড়া কাঁথার মত পরিত্যাগ করেছে।

সত্যিই এ যদি বিচার না হয় তো বিচার কাকে বলে ?

সুতরাং সতু বদ্যি তার দাবি জানায়— তার আগের একশ টাকা মিটিয়ে দিতে হবে, প্রতি দিনের চিকিৎসার টাকা নগদ দিতে হবে তবেই সতু বদ্যি তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে।

জসিমুদ্দিন সতু বদ্যির পা ধরে। সতু বদ্যি যাদুকর। তার দিল আসমানের মত বিরাট। সে বড়ে মিঞাকে বাঁচিয়েছে, হামিদকে বাঁচিয়েছে। মজিদকে বাঁচিয়েছে আর রমজান সতু বদ্যির কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বলেই না মরে গিয়েছে।

সেই সতু বদ্যি কি জসিমুদ্দিনকে মাপ করবে না। জসিমুদ্দিনের ওপরে একটু দয়া করবে না ?

না, সতু বদ্যি তা করবে না। বে-সরম ইবলিশের বাচ্চা, হারামজাদা জসিমুদ্দিন দয়ার অযোগ্য। তাকে দয়া করাও পাপ।

বেত্রাহত কুকুরের মত পলায়মান জসিমুদ্দিনের অপস্রিয়মান দুর্বল দেহের দিকে তাকানোর যে সুখ সে সুখ সতু বদ্যি যেন দু-চোখে ভোগ করে শেষ করতে পারে না। মনে হয় 'লক্ষ কোটি নয়ন হলে হত যে মোর ভালো'।

কিন্তু জসিমুদ্দিনের ইলাজ সতু বদ্যির শুরু করতে হয়। আগের একশ টাকা উসুল না করেই শুরু করতে হয়। নগদ টাকা পাবার আশা ত্যাগ করেই শুরু করতে হয়। কেন জানেন?

পরের দিন কলিমুদ্দিন আসে।

তার চোখ দুটো চকচক করে। সাদা দাড়ি আর গভীর বাদামী গায়ের রঙের মাঝখানে ঘোলাটে ভেজা ভেজা চক্‌চকে দুটো চোখে সে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার সাহেবের দিকে। সে সতু বদ্যির অনেক প্রশংসা করে। সতু বদ্যির দিল আসমানের মত। সতু বদ্যির দাবাইএ যাদু আছে।

তারপরে বিনয়ে কড়া বুট জুতোর সুকতলাটি হয়ে সতু বদ্যিকে উপদেশ দেয়, তার বস্তির সামনে যে পচা ডোবাটা আছে তার চাইতেও নোংরা যে খোলা ড্রেনটা আছে তার চাইতেও নোংরা যাদের জিন্দিগী তাদের কসুর ছোট করে দেখতে হয়, বড় করে দেখতে নেই। আর কসুর থাক চাই না থাক মরজ তো ওদের সাথী। করিম-এর বাপ্‌দাদা পরদাদার কসুরে করিমের তালুতে ফুটো হয়েছে। কিন্তু কলিমুদ্দিনের কোন কসুর তো ছিল না তবুও তার ফেপড়াতে ফুটো হয়েছে—আবার মালিকের কসুরে ফিদা হোসেনের পেট পুড়েছে তাইতে কলিমুদ্দিন বুঝতে পেরেছে কসুরের সঙ্গে মুসিব্বতের কোন তাল্লুক নেই।

ডাকটর সাহেব তো বড়ে মিঞার চাইতে অনেক বেশী পড়া লিখাওয়ালা আদমী—অনেক বেশী শরীফ্—ডাকটর সাহেব এ কথা নিশ্চয়ই বোঝেন। সেজন্যে বড়ে মিঞার অনুরোধে জসিমের জিম্মা ডাকটর সাহেবের নিতেই হবে।

আর টাকা? টাকা কলিমুদ্দিন চাঁদা উঠিয়ে যোগাড় করবে। ছুটি মালিকের সঙ্গে লড়াই করে আদায় হবে। জসিম ওদের তরফে এলে তো ষোল আনা ঐক্যই হয়ে গেল কিনা—তাইতে।

সতু বদ্যির প্রশ্নের শেষ নেই। কিন্তু এবার কি কারখানার সবাই চাঁদা দেবে? এ তো সেই জসিম। কলিমুদ্দিন বলে, দেবে। সবাই দেবে। এক বছরে ফিদার ফোড়া আর রমজানের মৃত্যু—হামিদ-মজিদের ফোড়ার অসুখ আর বড়ে মিঞার ব্যারাম—সব মিলে দিমাগ সাফ করে দিয়েছে।

কলিমুদ্দিন তাকিয়ে থাকে তার ভেজা ভেজা বড় বড় চোখে। তাতে আগুন প্রায় নেই বললেই চলে—খালি জল।

আর প্রচুর বিশ্বাস।



নিশির ডাক

ভাঙা মেয়েলী গলার বিকৃত আওয়াজ মাঝরাতের অন্ধকার ভেদ করে কানে এসে ঢোকে। শুধু কান নয় সারা শরীরটাই শিউরে ওঠে অথচ এমন কিছু বলেনি, খালি 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু' বলে পিছু ডেকেছে। ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকিয়ে আলকাতরার মত গভীর অন্ধকারের ভিতরে সাদা শাড়ীতে জড়ানো একটা মূর্তি সতু বদ্যি দেখতে পায়। এবার আর শব্দ নয়, স্পর্শও নয় শুধু দৃষ্টি—তাইতে শরীরটা আবার শিউরে ওঠে।

সতু বদ্যি কি ভয় পায়? কত শীত, কত বর্ষা, কত রোদে-পোড়া দুপুর, বর্ষা-ভেজা মাঝরাত, কত খোলার চাল আর ভাঙা টিনের নীচে সতু বদ্যি কাটিয়েছে—কই ভয় তো পায়নি। কত মড়া কত আধমরা পাহারা দিয়েছে কত অন্ধকার রাতে—কই ভয় তো পায়নি। তাহলে আজ ভয় পেল কেন? পিঠের শির-দাঁড়া থেকে সারাটা শরীর যেন শির শির করে ওঠে।

বর্ষার রাত তখন অনেক হয়েছে। অনেক অনেক রাত, মাঝরাত যদিও হয়নি কিন্তু হতেও দেরি নেই বেশী। তবুও অনেক রাতই বলতে হবে কারণ তখন বর্ষাকাল, বিজলী বিকল হওয়াতে আশে পাশের রাস্তাগুলো অন্ধকার। আকাশে মেঘ থমথম করছে—

নগরীর দীপ নিবেছে পবনে
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে
নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

সেই সময়ে রুগী দেখে গ্যারেজে গাড়ি তুলে দিয়ে চাবির থোলোটা হাতে নিয়ে সতু বদ্যি বাড়ি ফিরছে। গ্যারেজটা সতু বদ্যির বাড়ি থেকে একটু দূরে, তিন-চার মিনিটের রাস্তা। অন্ধকারে—ঘন অন্ধকারে—গোটা পাড়াটা ঢেকে আছে, মাঝে মাঝে বাদলা হাওয়া সোঁ সোঁ করে দরজা-জানলা নাড়িয়ে দিয়ে

বয়ে চলেছে। সামান্য সামান্য গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। পা টিপে টিপে সত্তর টাকা দামের জুতো জোড়াটা কোন রকমে জলকাদার হাত থেকে বাঁচিয়ে সতু বদ্যি বাড়ি ফিরছে। চারদিকের নিঃশব্দ পশ্চাৎপট আর মাঝে মাঝে বাদলা হাওয়ার আর্তনাদ একটা ভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। সতু বদ্যি সবে তার নিজের বাসার গলির দিকে মোড় ফিরবে হঠাৎ পিছনে পানের দোকানের কাছ থেকে আওয়াজটা এল—'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু।' বাদলা হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে তাল রেখে যেন আওয়াজটা এল। সতু বদ্যি পিছনে তাকিয়ে দেখলো সাদা শাড়ীতে জড়ানো পা থেকে মাথার ঘোমটা অবধি একটা নারী মূর্তি। আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে সতু বদ্যি এগিয়ে গেল। মূর্তিটা কি শরীরী না অশরীরী? একটু কাছাকাছি যেতে মূর্তিটার হাতটা একটু নড়ে উঠলো। সাদা শাড়ীর প্যাঁচের ভিতর থেকে হাতটা বেরিয়ে এলো। একটু ঝুন্ ঝুন্ করে আওয়াজ হল। না মণিবন্ধের চুড়ির আওয়াজ নয়, মুঠোর ভিতরকার চারটে টাকার আওয়াজ।

'আপনার ফি-টা নিন ডাক্তারবাবু, আমি আশা।'

সতু বদ্যি হাতটা অর্ধেক বার করে কিছু বুঝতে পারে না। টাকা নেবে কি নেবে না? নির্জন অন্ধকার রাস্তায় সোঁ সোঁ বাদলা হাওয়ার ভিতরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে হাতটা আধখানা তুলে সাদা শাড়ীতে মোড়া আশার সামনে সতু বদ্যি দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে না—মানে হাতটা বুঝতে পারে না টাকাটা নেবে কি নেবে না। যেন 'শৈলাধি রাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ'।

সে নিবিড় অন্ধকার পটভূমিতে আশার গোটা জীবনটাই সতু বদ্যির সামনে ভেসে ওঠে। অন্ধকারে শাড়ীর রঙের মত সাদা হয়ে ভেসে ওঠে না। আশার জীবনটাও তো কালো—গভীর তিমিরাচ্ছন্ন কালো।

সাত-আট বছর আগে যখন আশার সঙ্গে সতু বদ্যির প্রথম দেখা হয় তখন তার পরনে সাদা শাড়ী ছিল না। কালীঘাট অঞ্চলে ঘিঞ্জি গলির ভিতরে একটা একতলা বাড়ি। মালিক আপিসের কেরানী। সতু বদ্যিকে খবর দিয়েছে তার নিজেরই জ্বর হয়েছে বলে। কড়া নাড়তেই ভদ্রলোকের স্ত্রী আশা দরজা খুলে দিলেন। নিখুঁত গৌরবর্ণা, তন্বী সুন্দরী আশা সেদিন সতু বদ্যিকে হয়তো চমকই লাগাতে পারতো। শুধু তার শারীরিক সৌন্দর্যে আর পোশাকেই নয় সেদিন তার অভ্যর্থনার ভিতরে শ্রীযুক্তা আশার সাধারণ ভদ্রতার চাইতে আরও বেশী কিছু ছিল। কিন্তু রুগী দেখতে গিয়ে সেদিকে মানে যেদিকে ভদ্রতার চাইতেও

বেশী জিনিস ছিল সেইদিকে সতু বদ্যির নজর পড়েনি আর তা ছাড়া সুরেশ-বাবুকে সতু বদ্যি শুধু মক্কেল হিসাবেই খাতির করতো না, আপিসের কেরানী হলেও সুরসিক ও শিক্ষিত বলে শ্রদ্ধাও করতো। সুতরাং তার সঙ্গে বন্ধুত্বকে অনেক বেশী দাম দিত বলেই তার স্ত্রী আশার চালচলনের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি তার নজরে এড়িয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া সতু বদ্যি শ্রীযুক্তা আশাকে খুব বিশেষ রকম খারাপ বলে ভাবতে পারেনি। ভাবার তো কোন যুক্তিও নেই। যৌবনোচ্ছল মেয়েদের বিশেষ বয়সে যে ক্ষমতা থাকে স্থানে অস্থানে তারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেশ আনন্দ পায়। সবাই পায়—তবে কম আর বেশী। একটু বিশেষ সুন্দরী মেয়েরা আবার বেশীর দলেই পড়ে। বেড়াল যেমন ইঁদুর খেলিয়ে আনন্দ পায় অনেকটা হয়তো সেই রকমই আনন্দ। এতে তো দোষের কিছু নেই। যেমন নেই চুম্বকের লোহা আকর্ষণে কিংবা চাঁদের সমুদ্রের জল টেনে জোয়ার ভাটা করায়। তাইতে সতু বদ্যি শ্রীযুক্তা আশার চালচলনকে বিশেষ গ্রাহ্যই করেনি। দু-একজন বন্ধুস্থানীয় লোক সতু বদ্যির এ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তাঁরা অনেকে হয়তো আশাদেবীর পিছনে-ফেলে-আসা কুমারী জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে চেয়েছেন। হয়তো কটা হৃদয় আশা দেবী ভেঙেছেন কিংবা কজন তরুণের কৌমার্য অতীতের ইতিহাসের কোঠায় ঠেলে দিয়েছেন সেইসব হিসাব দিতে এসেছেন।

কিন্তু সতু বদ্যি গ্রাহ্য করেনি। বয়সে তো বটেই মনেও ততোধিক বৃদ্ধ সতু বদ্যি। সদ্য বিবাহিত কিংবা সদ্য বিবাহোন্মুখ যুবক-যুবতীদের দেখতে সতু বদ্যির চিরকালই ভালো লাগে। নানা রকমের ক্লেদ ও কদর্য পরিবেশের মাঝখানে হয়তো সদ্যোজাত শিশু আর তার মা কিংবা হয়তো সদ্যবিবাহিত যুবক-যুবতী এরা যেন সতু বদ্যির কাছে মরুভূমির ভিতরে মরুদ্যান। বড় নরম চোখে দেখে এদের সতু বদ্যি। তাইতে সেই উদ্যানের কুসুমের কীট সতু বদ্যির চোখ এড়িয়ে যায়।

তা ছাড়া সতু বদ্যি আশাদেবীকে দেখেছে মা হতে। দেখেছে বিনিদ্র রাত জাগতে রুগ্ন শিশুর সামনে। সতু বদ্যিও হয়তো রাত জেগেছে তার সঙ্গে। কি করে মনে করবে সতু বদ্যি সে কথা?

রুগ্ন শিশুর সামনে যে ছেলেটি বার বার আশাদেবীকে সাহায্য করতে আসতো তার সঙ্গে কি আশাদেবীর কোন সম্পর্ক ছিল? কোন নীতিবহির্ভূত

সম্পর্ক ? সতু বদ্যি জানে না। পাড়ার শুভাকাঙ্ক্ষী দু-একজন বলেছিলেন বটে : সুরেশবাবুর সঙ্গে আশাদেবীর দু-একদিনের একটু বিশেষ মনোমালিন্যের কথা। সতু বদ্যি হয়তো লক্ষ্যও করেছিল কিন্তু তারপর সে ছেলেটিকেও সতু বদ্যি সে বাড়িতে দেখেনি আর নিজেও ভুলে গেছে।

আর ভুলে না গেলে রাতদুপুরে যখন অর্ধেক রাত জাগিয়ে রাখার পর সুরেশবাবু সতু বদ্যিকে ফি-এর প্রশ্ন করেন তখন সতু বদ্যি ফি নিতে আপত্তি করেবে কেন ? ফি ফিরিয়ে দেবেই বা কেন ? তবু সতু বদ্যি ফিরিয়েই দিয়েছিল।

সুরেশবাবুর তখন দু-দুটো ছেলে মেয়ে, স্ত্রী—তার চাপেই সংসার ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। সতু বদ্যি হয়তো ভেবেছিল নিজের চাপটা সরিয়ে নিলে যদি কয়েকদিন সংসারটা চলে। হয়তো সতু বদ্যি চায়নি পণ্ডিত সুরেশবাবুর পাণ্ডিত্য নষ্ট হয়ে যাক, হয়তো চায়নি রসিক সুরেশবাবুর রস শুকিয়ে যাক। তাইতেই হয়তো বিনি মজুরিতে খেটেছিল ওদের জন্যে।

সত্যি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রসে, ভালবাসায় সবদিক দিয়ে সুরেশবাবু সত্যিকারের মানুষ। সতু বদ্যি তো জানে রসিক লোক কোটিতে গোটিক হয়। সুতরাং তার দাম সতু বদ্যি বোঝে। কিন্তু ক্রমশ বেচারা সুরেশবাবুর ওপরে সংসারের চাপ বেড়েই যেতে লাগলো। এজন্যে মাঝে মাঝে বিরক্ত হত সতু বদ্যি আশাদেবীর ওপরে। না, কখনো সতু বদ্যির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি আশাদেবী বরং চিরকালই ভদ্রতার অতিরিক্ত ভালো ব্যবহার করেছেন কিন্তু তবুও আশাদেবীর প্রসাধন আর পোশাকের চাকচিক্য মাঝে মাঝে খারাপ লাগতো। রসিক স্বামী—মানে ধরুন রসিক নাগর—সে তো চাইবেই তার স্ত্রীকে সুসজ্জিত করতে কিন্তু তা বলে আশাদেবীর তো বিবেচনা থাকা উচিত। শাড়ীর জরীর জন্যে যদি পাঞ্জাবীটা আদ্দি থেকে লংক্লথ হয়ে যায় তা হলে সেই পাঞ্জাবীর যে মালিক তার মালিকের তো নজরে পড়া উচিত। সাদা ভ্যানিসিং ক্রীম কিংবা ফেস্ পাউডার যদি শিশুর ততোধিক সাদা দুধে হাত দেয় তাহলে তো মায়ের নজরে পড়বে। কিন্তু তাতেও খুব একটা খারাপ সতু বদ্যির লাগেনি।

আশাদেবীর নজরে না পড়লে কি হয়। যার পড়বার কথা তার ঠিক নজরে পড়েছে মানে ধরুন সুরেশবাবুর। তাকে দুখানা ঘরের ভিতরেও একখানা ঘর ভাড়া দিতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কিছু তো সুরাহা হবে। তাঁকে দু-বেলা তিনটে টিউশনি নিতে হয়েছে।

একদিন সতু বদ্যি সুরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা আপনি টিউশনি আর কেরানীগিরি, কেরানীগিরি আর টিউশনি, টিউশনি আর এই ঘুপচি ঘর—এতে কী আনন্দ পান বলতে পারেন?' সে জিজ্ঞাসাও সতু বদ্যি করেছিল কেরানীগিরি আর টিউশনি শেষ করা দিনের শেষে। তার উত্তরে জবাব দিলেন সুরেশবাবু, 'সকালের টিউশনির পরে হয়তো চান করে খেয়ে আপিসে যাচ্ছি, ছেলে এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরে বললো বাপী সোনা আজকে আপিসে যেও না, আমার সঙ্গে খেলা করো কিংবা হয়তো সন্ধ্যেবেলা আপিস থেকে ফিরলে বৌ এসে রেকাবে রুটি আর তরকারী সাজিয়ে দিয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে সামনে এসে বল্‌লো, জানো তোমার ছেলে আজ কি করেছে? এসব কথার দাম তো ডাক্তারবাবু সারাদিন খেটেও শোধ করা যায় না, সারাজন্ম খেটেও শোধ করা যায় না।'

ব্যাধি আর দারিদ্র্যের পঙ্কের ভিতরে আকণ্ঠ স্নান করতে করতে মাঝে মাঝে সতু বদ্যি এ সব আলোর ঝলকানি দেখে। তাইতে এ সব ঝলকানির দাম সতু বদ্যির কাছে বড্ড বেশী।

বেশী দাম আছে বলেই কি টিকল না? রাতদুপুরে যখন সেদিন ডাক এল সুরেশবাবুর ঠিকানা থেকে তখন নেহাতই সুরেশবাবুর ঠিকানা বলেই সতু বদ্যি বিনা প্রশ্নে গিয়ে হাজির হয়েছিল। হোক না রাতদুপুর সুরেশবাবু ডেকেছেন যাওয়াই উচিত। গিয়ে পৌঁছতেই সুরেশবাবু দরজা খুলে দিলেন। দিয়ে বললেন 'আমার ঘরে নয়, ওঘরে।'

কালোরঙের ওপরে রাত দুপুরে হাতের নখ আর পায়ের নখ আরও কালো হয়েছে কিনা দেখা শক্ত তবে নিশ্বাসে গন্ধ পাওয়া যায়। আর চোখের তারা ছোট হয়ে আলপিনের মুখের মত বিন্দুতে পরিণত হয়েছে তাও টর্চ জ্বেলে বোঝা যায়।

বৌটি আফিম খেয়েছে। একটু রহস্যজনক পরিস্থিতি!

সুরেশবাবুর হাত থেকে নিয়ে বাংলা ভাষায় ভাঙা ভাঙা মেয়েলী হাতের লেখা চিঠিটা পড়ার পরে রহস্য আর থাকে না। বৌটি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। নিজে ইচ্ছে করে আফিম খেয়েছে কারণ আশাদেবী তার স্বামীকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। যার স্বামী নেই মানে বেদখল হয়েছে তার তো বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। তাইতে সে দ্বন্দ্ব না বাড়িয়ে স্বামীর পথের কাঁটা নিজেই পরিষ্কার করে দিল। নাটকীয় পরিস্থিতি না? তবে নাটক

দেখলে তো চলবে না তখুনি রুগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। আর সেই সঙ্গে তার চিঠিটাও।

পরদিন বৌটি হাসপাতালে মারা যায়। ঠিক করে যে আশাদেবী ঘর পাল্টালো সেটা সতু বদ্যি জানে না। সুরেশবাবুর বাড়িতে অনেকদিন সতু বদ্যির ডাক পড়ে না। ছ-মাস পড়ে হরিশবাবু বলে একজন ভদ্রলোক ডাকতে এল সতু বদ্যিকে, 'আপনার একজন পুরনো রুগীকে কি দেখবেন ডাক্তারবাবু?'

'পুরনো নতুন সব রুগীই দেখবো—কেন দেখবো না?' সতু বদ্যি রওনা হয়—সেদিনও সতু বদ্যির দরজা খুলে দেন আশাদেবী। আশাদেবী এখন হরিশ-বাবুর সঙ্গেই থাকছেন। প্রশ্ন সতু বদ্যি জিজ্ঞাসা করে না। তবে সুরেশ-বাবুর যে ভাড়াটের স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল তিনি হরিশবাবু নন। সুতরাং সতু বদ্যির জ্ঞানে আশাদেবীর এটা তৃতীয় ঘাটে নোঙর করা। আশা-দেবীকে সতু বদ্যি পরীক্ষা করে। ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়। আগেকার পরিচিত আশাদেবী তাঁর গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁটে মৃদু হেসে একটু বেশী হেসে অন্তরঙ্গ ভাবে সতু বদ্যিকে কৃতজ্ঞতা জানান 'তবুও আপনি এলেন ডাক্তারবাবু। আপনি ছাড়া আমার আর কারো ওপরে বিশ্বাস হয় না।'

সতু বদ্যি কাষ্ঠহাসি হেসে উত্তর দেয়, 'আসবো না কেন। আমাকে রুগী যেখানে ডাকবে সেখানেই যেতে হবে। তবে আপনার যখন সামান্য পরিবর্তন হয়েছে তখন আপনার আমাকে ডাকলেই আট টাকা দিতে হবে। তাছাড়া যাতায়াতের খরচা দিতে হবে। যদি কখনও টেলিফোনেও কথা বলেন তা হলেও আপনার নামে চার টাকার বিল আসবে। আপনার সঙ্গে আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক।' নির্বিকার মুখে সতু বদ্যি বেরিয়ে আসে।

কিন্তু গাড়িতে উঠে সতু বদ্যি ভুলতে পারে না সুরেশবাবুকে। ভুলতে পারে না সুরেশবাবুর বাপী সোনা হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলছে 'বাপী সোনা আজকে আপিসে যেয়ো না, আমার সঙ্গে খেলা করো'। সর্বাঙ্গ রী রী করতে থাকে সতু বদ্যির। সত্যি রী রী করতে থাকে।

এর পরেও আশাদেবীর বাড়িতে সতু বদ্যি গিয়েছে। বহুবার গিয়েছে। আশা-দেবীও অনেকবার এসেছেন সতু বদ্যির চেম্বারে। প্রতিবার গুণে গুণে টাকা নিতে ভুল করেনি সে। আশাদেবীর সঙ্গে কথা বলা যেন সতু বদ্যির একটা ধৈর্যের পরীক্ষা। যাকে সতু বদ্যির দেহের প্রতিটি কোষ ঘৃণা করে তার সঙ্গে অমায়িক

হেসে ব্যবসায়িক কথা বলা সত্যিকারের ধৈর্যের পরীক্ষাই বটে।

তবে আশাদেবীর কর্তব্যের ত্রুটি হয়নি। হরিশবাবুকেও একটি কন্যা উপহার দিয়েছেন আশাদেবী। আর সে কন্যারও চিকিৎসা সতু বদ্যিকে করতে হয়েছে। তবে জীবনে বোধ হয় প্রথম সতু বদ্যি মনের ভিতরে রাগে জ্বলে পুড়ে গিয়েছে আশাদেবীর মেয়েকে আদর করা দেখে। মা মেয়েকে আদর করবে তাতে দোষের কি? কিন্তু সেই দৃশ্যের সামনে যখন চোখের ওপর ভেসে ওঠে সুরেশবাবুর ভাঙা সংসার আর নোংরা ঝিয়ের হাতে সমর্পিত সুরেশবাবুর আদরের বাপী সোনা তখন আর সতু বদ্যি মার আর মেয়ের আদরের দৃশ্যের মাধুর্য উপভোগ করতে পারে না।

মাঝে একবার বাপী সোনার হাম হয়েছিল। খুব জ্বর—একশ চার-পাঁচ হবে। সময় পেলে সতু বদ্যি গিয়ে সুরেশবাবু না ডাকলেও বাপী সোনার মাথার কাছে বসে থাকতো। বেহুঁশ বাচ্চাটা যখন জ্বরের ঘোরে 'মা', 'মা' বলে সতু বদ্যির হাত হয়তো চেপে ধরতো তখন সতু বদ্যি বাপী সোনার ওপরে অনুকম্পা এবং আশাদেবীর ওপর ঘৃণা—এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবে অস্থির হয়ে উঠতো।

এই জন্যেই ডাক্তারদের রুগীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হতে নেই—আর খুব ঘনিষ্ঠ লোকদের ডাক্তার হতে নেই। কিন্তু বাপী সোনাকে সতু বদ্যি না দেখলে বারে বারে অন্য ডাক্তার ডেকে দেখাবার মত আর্থিক অবস্থা তো সুরেশবাবুর নেই। আর শুধু তো বাপী সোনা নয়, বাপী সোনার ভাই বাবুয়াও আছে। মা-হারা ছেলেপিলেদের অসুখও বেশী করে।

এ রকম অসুখ বিসুখে আশাদেবী মাঝে মাঝে—মাঝে মাঝে কেন প্রায় রোজই সতু বদ্যির কাছে আসেন। এসে হয়তো বলেন তাঁর কান কট কট করছে কিংবা মাথা দপ্ দপ্ করছে। সতু বদ্যি আশাদেবীকে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়, হাত পেতে ফি নেয়। আশাদেবী ওঠেন তারপরে যাবার সময় হঠাৎ পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করেন, বাপী সোনা কেমন আছে? বা বাবুয়ার জ্বর ছেড়েছে? উত্তরটা সতু বদ্যি ঠিকই দেয়। ক্রমশঃ সুরেশবাবুর ছেলে-দের কারো অসুখ বিসুখ করলে পরের দিন আশাদেবীর কান কট্ কট্ কি মাথা দপ্ দপ্ করা দেখাতে আসা প্রায় নিয়মেই দাঁড়িয়ে গেল আর যাবার সময় হঠাৎ পিছন ফিরে ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নেয়া সেটাও নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়।

তবে হরিশবাবুর বাড়িতে আশাদেবীর সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হল সেদিনকার কথা মত পয়সা ছাড়া আশাদেবীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই সতু বদ্যি রাখেনি। ক্রমশ আশাদেবী ভদ্রতার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা ছেড়েই দিলেন। এমন কি অর্থের প্রতিদানে ডাক্তারের সঙ্গে যতটুকু ব্যবসায়িক ঘনিষ্ঠতা প্রাপ্য তাও পেতে চেষ্টা করতেন না।

ব্যাপারটা চরমে দাঁড়ায় মাস পাঁচ-ছয় আগে। আশাদেবীর মেয়ের হঠাৎ ভেদবমি হতে থাকে। ঐটুকু বাচ্চা—তার ভেদবমি বেশ বিপজ্জনক। বাচ্চার জিভ শুকিয়ে কাগজের মত শুকনো খটখটে হতে আর চোখ বসে গর্তে ঢুকে যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো। আর সতু বদ্যি গিয়ে যখন পৌঁছলো সেও আরও আধঘণ্টা বাদে। তখন ব্রহ্মতালু অবধি শুকিয়ে গেছে।

রুগী দেখে সতু বদ্যি বললো, একে এক্ষুনি সেলাইন দেয়া দরকার তাছাড়া বাঁচানো যাবে না। আশাদেবী তাইতে রাজী। সতু বদ্যির ওপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু সতু বদ্যি তখনও রাজী নয়। সেলাইন দেয়ার জন্যে একশ টাকার দরকার এবং সতু বদ্যি সেটা আগামই চায়। সেই টাকাটা সতু বদ্যির চাই তবে সে সেলাইন দেবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে তখন আশাদেবীর কাছে অত টাকা নেই। তিনি করুণভাবে মিনতি করেন একটা দিন সময় দেয়ার জন্যে। সতু বদ্যি রাজী হয় না। টাকা তার আগাম চাই। শেষ পর্যন্ত আশাদেবী গলার হার খুলেছেন, 'ডাক্তারবাবু এইটে আপনার কাছে থাকুক আপনি আমার খুকুকে বাঁচিয়ে দিন। আমি টাকা দিয়ে আপনার কাছ থেকে এটা ফেরৎ নিয়ে আসব।'

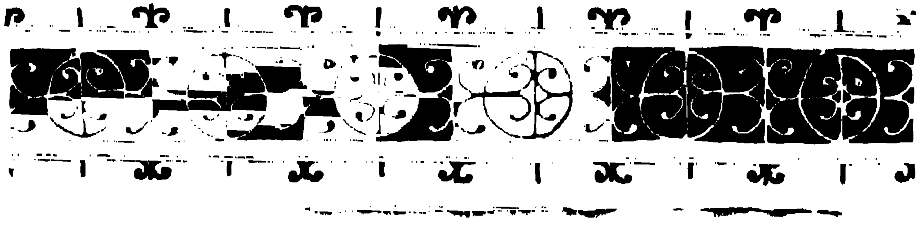
'সোনা রাখা তো আমার কাজ নয়।' সতু বদ্যি অম্লানবদনে বলে, 'তবে সোনা রাখে এরকম অনেক দোকানই তো আছে আপনার বাড়ির কাছে। আপনি সেখানেই যান না। আমি টাকা পেলেই খুশি।'

সেদিন শেষ রাত্তিরে বাচ্চাটাকে সেলাইন দিয়ে বড় হাল্কা মনে সতু বদ্যি বাড়ি ফিরেছিল। তবে বাচ্চাটার জীবন বাঁচিয়ে মনটা হাল্কা হল না আশা-দেবীকে দিয়ে গলার হার বিক্রি করিয়ে বেশী হাল্কা হল তা বলা শক্ত।

তবে আজ রাত্তিরে এই ঝড় বাদলার ভিতরে সুরেশবাবুর বাড়ি থেকে যখন সতু বদ্যি ফিরছিল তখন বর্ষার মেঘে ঢাকা আকাশের চাইতেও সতু বদ্যির মনটা থমথমে হয়েছিল। বাপী সোনা অসুস্থ—খুব গুরুতর অসুখ। একশ চারের ওপর জ্বর, আম আর রক্ত পায়খানা করছে। পেটের ব্যথায়

অমানুষিক চিৎকার করছে। এক কথায় যাকে বলে সত্যিকারের ব্যাসিলারী ডিসেন্টি। সন্ধ্যাবেলায় টেট্রাসাইক্লিন্ দিয়ে সতু বদ্যি চিকিৎসা শুরু করেছিল। মাঝরাত নাগাদ ছেলেটার অবস্থা একটু ভালোর দিকে ফিরল। তখন সতু বদ্যি বাড়ি ফিরছে। গাড়িতে সারাটা রাস্তা চিন্তা করেছে হতভাগা বাপী সোনার কথা আর ততোধিক হতভাগ্য সুরেশবাবুর কথা। গ্যারেজের দরজাটা বন্ধ করে যখন রাস্তায় নামলো তখন খালি ঝোড়ো হাওয়া আর অন্ধকার আকাশ। চারদিকের দরজা জানলা বন্ধ আর রাস্তার আলো নেবানো। আলকাতরার মত অন্ধকার যেন সুরেশবাবুর জীবনের রূপ প্রকাশ করছিল। ছ-মাস আগেকার শেষ রাতে হাল্কা মন নিয়ে বাড়ি ফেরা আর আজকের বাড়ি ফেরার মধ্যে কত তফাৎ! আজ যেন একটা ভৌতিক আবহাওয়া। বাতাসের শব্দকে মনে হয় যেন কোন অশরীরী প্রেতের আর্তনাদ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ছপ্ ছপ্ শব্দ যেন অন্ধকারে বিচরণকারী অপার্থিব জীবের পদশব্দ। জীবন আর মৃত্যুর মাঝে সর্বস্তরের বহুকালের সাক্ষী সতু বদ্যিরও গা ছম্ ছম্ করতে থাকে আর তার ভিতরে ভাঙা মেয়েলী গলার আওয়াজ 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু।'

অন্ধকার পটভূমিকায় সাদা শাড়ীর রেখার ভিতর থেকে চারটে টাকা হাতের—অর্ধেক বার হওয়া হাতের—সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সতু বদ্যি আশাদেবীর বিভিন্ন রূপের কথা ভাবছিল। নিজের হাতটা এতক্ষণ পরে নিজের অজ্ঞাতেই পূর্ণ প্রসারিত হয়। চারটে কাঁচা টাকার ঝম্‌ঝমানি প্রেতের আর্তনাদের মত বাতাসের আওয়াজ ছাড়িয়ে বেজে ওঠে। আর ততোধিক বিকৃত ভাবে মাঝরাতে আশাদেবীর গলা বেজে ওঠে, 'ডাক্তারবাবু বাপী সোনা কেমন আছে? বাঁচবে তো?'



পুন্নামোনরকাৎ

'বাবাই, থাকুর দেখতে যাবে? থাকুর?'

তিন বছরের মেয়ে ডাক্তারখানার দরজায় এসে সতু বদ্যির হাত ধরে টানতে থাকে। তিন বছরের মেয়ের গায়ে কতই বা জোর? তবুও লোভ দেখায়। 'জানো, বাবাই—জগধাত্তি থাকুর—লাল তুকতুকে থাকুর। থাকুরের একটা সিংহ আছে। পোষা সিংহ, সে কাউকে কামড়ায় না। চাল খায় আর কলা খায়......'

ব্যাপারটা লোভনীয় তবে সতু বদ্যির যাবার ভরসা সেই। কিন্তু যাবে না বলেই বা কোন্ ভরসায়? মেয়ে তো কান—আসল মাথা মানে বদ্যিগিন্নী দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।

এ অবস্থায় বীর পুরুষদেরও ভয় পাবার কথা।

তবুও সতু বদ্যি ভরসা করে বলে ফেলে—না, যাবে না

কেন যাবে না? এই তো এইটুকুন রাস্তা—পনের-কুড়ি মিনিট মোটে লাগবে, ওইটুকু সময়ে কি আর সতু বদ্যির সব রুগী মারা যাবে?

আরে না তা নয়, রুগীর জন্যে নয়। রুগী তো আছেই, রোজই আছে, সারা জীবনই থাকবে। রুগী নয় আসলে খুকীকে নিয়ে কোথাও যাওয়াই বিপজ্জনক।

এই ধরুন না। দুর্গা পুজোর সময় সতু বদ্যির নেমন্তন্ন হয়েছিল গড়পারের এক বাড়িতে। পুজো দেখার আর প্রসাদ পাবার। সবাই গিয়েছিল নেমন্তন্নে। সতু বদ্যি আর বদ্যিগিন্নী, খুকী আর বড় খুকী। বড় খুকী মানে খুকীরই মত সতু বদ্যির এক ভাইঝি।

প্রথম তো গিয়ে বসল সবাই ঠাকুর ঘরে। ঠাকুরই যদি দেখতে হয় তাহলে কাছে গিয়ে দেখাই ভালো। তারপর শুরু হল প্রশ্ন। আচ্ছা দুর্গার যদি দশ হাত তাহলে অসুরের মোটে দুটো হাত কেন? অসুরকে নীল ডাউন করে

দিয়েছে কে ? সিংহটা কেন অসুরকে কামড়ে ধরেছে ? খাবে বলে ? তা মোষটা তো পড়ে আছে সেটাকে খেলেই পারে ? অসুরের মাংস বুঝি মিষ্টি ? আচ্ছা মা দুর্গার মাংস ? তেতো না মিষ্টি ?

আচ্ছা বলুন ? এর পর চুপ করে থাকা যায় ? এ তো প্রায় মার খাবার যোগাড়। বলে কিনা মা দুর্গার মাংস ? সতু বক্সি আর বক্সিগিন্নী তাড়াতাড়ি ভোলাতে চেষ্টা করে। মা দুর্গার মুকুট কী রকম চকচক করছে সেটা দেখানো হয়। গণেশ ঠাকুরের কলা বৌ দেখানো হয়—যাই হোক শেষ পর্যন্ত মা দুর্গার মাংসের কথা ওরা ভুলে যায়।

কিন্তু তাতেই কি রক্ষে আছে !

আবার শুরু হয় পুরুত ঠাকুরকে দেখিয়ে। লোকটা কে ? পুরুত ঠাকুর আবার কি রকম ঠাকুর ? আচ্ছা পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে কি দুগ্‌গা ঠাকুরের ঝগড়া ? তা ছাড়া পুরুত ঠাকুর দুর্গা ঠাকুরের গায়ে জল ছিটোবে কেন ? আচ্ছা পুরুত ঠাকুর মাথার পিছনে একটু চুল রেখেছে কেন! পুরুত ঠাকুরের মাথার পিছনে চুলে ফুল হল কি করে ?

সতু বক্সি আর বক্সিগিন্নী আবার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং চালচিত্তিরে পেট-মোটা মহাদেব দেখাতে হয়। গণেশ ঠাকুরের ভুঁড়ি দেখতে হয়—তবে পুরুত ঠাকুর রক্ষে পান।

কিন্তু তারপর যা হয় সে আরও ভয়াবহ।

খুকী বলে 'আচ্ছা পাখীর ওপরে খোকাটা বসে আছে কেন ? ও খোকাটা কে ?' বড় খুকী তাড়াতাড়ি তাকে সংশোধন করে 'বাঃ, ওটা পাখী হবে কেন ? ওটা তো মুরগী, ওর ঠ্যাং তো খায়। সেই যে স্যুপ হয়...... ।'

সুতরাং, সতু বক্সি আর বক্সিগিন্নীর সবৎস পলায়ন ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

তাইতে সতু বক্সি উপলব্ধি করেছে বাচ্চাদের নিয়ে পার্কে যাও, লেকের ধারে যাও কোন আপত্তি নেই। তবে পুজো বাড়ি ? কক্ষনো না। কিন্তু মেয়ে আবার হয়েছে হিরণ্য কশিপুর সন্তান পেল্লাদ। কোথাও ঠাকুর পুজো হয়েছে কি আর কথা নেই। নেমন্তন্ন হোক চাই না হোক সেখানে সে যাবেই। আর তারপরই শুরু হবে ঠাকুর বিশ্লেষণ।

মেয়ের টানাটানিতে সতু বক্সিও শেষ পর্যন্ত খানিকটা টলে ওঠে। অন্তত সিঁড়ি দিয়ে ফুটপাথ পর্যন্ত যেতে হয়।

খুকী একহাত দিয়ে বাবার হাত ধরে আর অন্য হাত দিয়ে ধরে মায়ের হাত। তারপর ঝুলে পড়ে শূন্যে। সতু বক্সির হাতে একটা হ্যাঁচকা টান লাগে। মেয়েটা হেসে ওঠে হি হি করে। বাবা-মায়ের হাতে হ্যাঁচকা লাগুক ওর তাতে কি? ও তো বেশ দোল খাচ্ছে। তবে হ্যাঁচকা লাগে সতু বক্সির হাতে আর সেই টানের সাথে শির শির করতে থাকে হাত ঘাড় বুক। দুলে ওঠে বুকটা। মৃদু হাসি ফুটে ওঠে মুখে। সতু বক্সি তাকায় বক্সিগিন্নীর দিকে। তারও একই অবস্থা—বুকটা দুলে উঠেছে আর মুখে মৃদু হাসি।

মেয়েটা দোল খায় দুজনের দুটো হাত ধরে আর হাসে হি হি করে।

সতু বক্সি আর বক্সিগিন্নী মুখ ফেরায় খুকুর দিকে—আওয়াজ শোনে শিশুর হাসির—হি হি হি। তাকায় মেয়েটার দিকে—মেয়েটা কিন্তু তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আর হাসছে হি হি হি হি। আর সামনে থেকেও প্রতিধ্বনি আসছে হি হি।

সতু বক্সি আর বক্সিগিন্নী দুজনেই তাকায় সামনের দিকে। তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। সামনের রাস্তায় যেন আয়নায় দেখা তাদেরই ছায়া। পাশাপাশি তারা আসছে উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে—স্বামী আর স্ত্রী। আর মাঝখানে দুজনের হাত ধরে আসছে খুকুর সমানই আর একটি খুকু—মাঝে মাঝে দুজনের দুটো হাত ধরে ঝুলে পড়ছে আর দোল খাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হাসছে—হি-হি-হি-হি।

যাদের হাত ধরে দোল খাচ্ছে তাদেরও মুখে মৃদু মিষ্টি হাসি। সতু বক্সির মনে হয় তাদেরও বোধহয় শির শির করে উঠছে হাত ঘাড়। দুলে উঠছে বুক।

সতু বক্সি তাকিয়ে থাকে, তাকিয়েই থাকে। সতু বক্সির মেয়েটা বক্ বক্ করে আর দোল খায়—আর মাঝে মাঝে হাসে হি-হি হি-হি। সতু বক্সি তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে—সামনের তিনজনের দিকে। পলক পড়েনা তার চোখে। সামনের তিনজন হাঁটতে হাঁটতে সতু বক্সিকে ছাড়িয়ে যায়, তার পিছনে চলে যায়।—সতু বক্সিও পিছনে তাকায়—তাকিয়েই থাকে। মোড় ঘুরে ওরা যখনঅদৃশ্য হয়ে যায় তখন চমক ভাঙে সতু বক্সির—তাও বক্সিগিন্নীর প্রশ্নে।

'এত কি দেখছ ওদের? এত কী রূপ বের হল ওদের হঠাৎ?'

অনেক অনেক রূপ বেরিয়েছে ওদের। রূপে রূপে অপরূপ হয়ে গিয়েছে ওরা

—সতু বদ্যি বলে। বদ্যিগিন্নী কি শুনতে চায় তা ?

তারপর আসর বসে সতু বদ্যির ডাক্তারখানায়, রোগীদের বসবার ঘর। বিরাট টেবিলটার চারপাশ ঘিরে বসে আছে হরেকরকম লোক।

ছু-মাসের মেয়ের পায়খানার রঙ খারাপ হয়েছে তাইতে উদ্বিগ্ন মনে বসে আছেন তরুণী অধ্যাপিকা। স্ত্রীর পেটে যক্ষ্মাজনিত রসের সঞ্চার হয়েছে বলে বসে আছেন কারখানার মজুর। কোমরের ব্যথায় চলতে অসুবিধা হচ্ছে বলে বসে আছেন পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা। আরও বসে আছেন বাতরোগগ্রস্ত জজ হয়ে রিটায়ার করা মুন্সেফ। স্কুলমাস্টার বাবার বহুমূত্র আর যক্ষ্মা হয়েছে বলে সন্ত-পড়া-ছেড়ে-দেয়া ফার্স্ট ইয়ারে পড়া ছেলে বসে আছে তার পাশে। আর তাদের মাঝখানে বসে সতু বদ্যি আর বদ্যিগিন্নী।

তারপর শুরু হল গল্প বলা।

ছোকরাকে সতু বদ্যি চেনে অনেক দিন হল। তবে ব্যবসায়িক আলাপ প্রথম হয় তিন-চার বছর আগে। তার আগে সতু বদ্যি ওকে দেখেছে—কর্ডরয়ের ট্রাউজার আর জিপ ফাস্‌নার দেয়া আমেরিকানদের মত ব্লাউজ ধরনের জামা গায়ে দিয়ে হয়তো রকে বসে থাকতে। কিংবা হয়তো দেখেছে এপারের রক থেকে রাস্তার অন্যপারের রকে বসা কারো দিকে ফ্লাই কিস্‌ (উড়োন চুমু) ছুঁড়ে দিতে। বেপাড়ার বৌঝিদের দেখে মুখে আঙুল দিয়ে সিটি বাজাতে যে দেখেনি তা নয়। আবার মড়া পোড়াতে আর নেমন্তন্ন বাড়ি পরিবেশন করতেও দেখেছে। বারোয়ারী পুজোয় মোড়লী করে হয়তো চাঁদার পয়সা-তেই রেস্তোরাঁয় বসে চপ কাটলেট ওড়াতেও যে না দেখেছে তা নয়।

সেই ছোকরা প্রথম এসেছিল তিন-চার বছর আগে। সতু বদ্যির সঙ্গে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আলাপ করতে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সতু বদ্যির মুখোমুখি বসল। লাজুক চোখ নামিয়ে নিল সতু বদ্যির প্রসারিত দৃষ্টির সামনে থেকে। ভীরু ভাবে দেখাল হাতের মুঠোয় একগোছা নোট। তারপর আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে একটু একটু করে বলল তার বক্তব্য।

ছোকরার পরিচিত একটি মেয়ে—অবিবাহিত মেয়ে, তার সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সামান্য ছু-মাস। সতু বদ্যি কি সে সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করতে পারে ? বন্দোবস্ত মানে সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়া।

সেদিন সতু বদ্যি তাকে বলেছিল সেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে

দেখা করতে।

মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটি এল তার পরদিন। সতু বক্সির পাড়ার নয় অন্য পাড়ার মেয়ে। বছর কুড়ি-একুশের শ্যামলা রঙের সাধারণ বাঙালী মেয়ে। সতু বক্সির চতুর প্রশ্ন আর অভিজ্ঞ দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আর গোপন থাকেনি সেদিন।

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য ইস্কুলে চাকরি করা থার্ড ডিভিশানে ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে। খালি গলায় গানও গায় নাকি ভারি মিষ্টি।

ছোকরার সঙ্গে আলাপ প্রায় এক বছরের। সে-ই দায়ী তার এই অবস্থার জন্যে।

না, ছোকরা ম্যাট্রিক যদিও পাশ করেছে কিন্তু বিশেষ কিছুই করে না।

দৈহিক আর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয় সব খবরই আস্তে আস্তে সতু বক্সির জানা হয়ে যায়।

তারপর সতু বক্সি প্রকাশ করে তার মতামত। প্রথমে বলে পরস্পরের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন বিশ্বাসঘাতকতা কত বড় পাপ। আর বলে অনাগত শিশু হত্যা—নিজের রক্ত মাংস থেকে যে শিশু হয়েছে তাকে হত্যা করা কত বড় অপরাধ। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না। তারপর সতু বক্সি বলে সন্তান কত স্নেহের কত আদরের! বলে সন্তান কত অমূল্য সম্পদ।

কিন্তু ছোকরার মনে দাগ কাটে না।

তারপর সতু বক্সি বলে ঋগ্বেদের বাণী—

অঙ্গাদ অঙ্গাৎসম্ভবসি হৃদয়াদ অধিজায়সে।

আত্মাবৈ পুত্র নামাসি ত্বং জীব শারদঃ শতম॥

প্রতি অঙ্গ থেকে যার সম্ভাবনা, হৃদয় থেকে যার জন্ম সে পুত্র থেকে নিজে তো অভিন্ন। তাকে পুত্র বলা মানে নিজেকেই পুত্র সম্বোধন করা—তার শত শরৎকাল জীবন কামনা করাই বিধেয়—মৃত্যু কামনা নয়।

মনে হয় মেয়েটি হয়তো একটু বিচলিত হয় কিন্তু ছোকরা কিছুতেই মত পরিবর্তন করতে চায় না।

সে অনেক কথা বলে, বলে আর্থিক অসুবিধার কথা—বলে জাতের গোলমালের কথা—বলে পারিবারিক গোলমালের কথা। তবে ওসব কথাই বাজে কথা। আসল কথা হল হঠাৎ ও একেবারে প্যাঁচে পড়ে গিয়েছে তা থেকে উদ্ধার পেলে ও এখন বাঁচে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন জানোয়ার।

'আর মেয়েটির একদিনের হয়তো এক মুহূর্তের ভুলের খেসারত হিসাবে আপনি ওই জালিয়াতের হাতে মেয়েটিকে সারা জীবনের জন্যে সমর্পণ করতে চাই-ছিলেন, ডাক্তারবাবু?' প্রশ্ন করেন ছয় মাসের বাচ্চার পায়খানার রঙের গোলমালের জন্যে আসা তরুণী অধ্যাপিকা।

না, অতটা সতু বদ্যি ভাবেনি, তবে সতু বদ্যি জানেন তো আসলে মিস্তিরী। অক্ষর পরিচয় থাকলেও ঠিক শিক্ষিত তাকে বলা যায় না। সে ওস্তাদের কাছে শিখেছে, জীবনকে অনুসরণ করো, মৃত্যুকে পরিহার করো। তাইতে সোজা রাস্তা ছাড়া সতু বদ্যির চোখে পড়ে না।

পড়লে হয়তো সতু বদ্যি এ উপদেশ দিত না। যাই হোক গল্পটা।—

এইবার সতু বদ্যি রেগে যায়। না, সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট করতে কোন সাহায্যই সে করতে পারবে না। আর শুধু তাই নয় কড়া নজর রাখবে সতু বদ্যি ওদের দিকে, যদি ওদের কোন বেচাল দেখে তাহলে পুলিসের শরণাপন্ন হতেও সতু বদ্যি দ্বিধা করবে না।

ছেলেটি চলে যায় বেত্রাহত কুকুরের মত। মেয়েটিও চলে যায়। যাবার সময় একবার তাকায় সতু বদ্যির দিকে। ভেজা ভেজা কালো এক জোড়া চোখ। বুঝতে পারে না সতু বদ্যি কি আছে ও দুটো চোখে—ভয়? ধন্যবাদ? ঘৃণা? কৃতজ্ঞতা?

তারপর ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর দেড়েক আগে। রেল লাইন পেরিয়ে শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে একটা বাড়ি, একতলা পাকা বাড়িই, পাকা মানে মেঝেটা পাকা—দেয়ালটাও পাকা, তবে ছাদটা অ্যাসবেস্টসের। একখানা ঘর। শোবার ঘর, বসবার ঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর সবই সেইটে। সেই ঘরে উদ্বিগ্না মা একটি ডিপথিরিয়া আক্রান্ত বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছেন। গলার দু-পাশটাই ফুলে গিয়েছে। নাড়ীর গতি নিশ্বাসের গতি শরীরের উত্তাপের তুলনায় অনেক বেশী আর তাছাড়া হাঁ করিয়ে গলার ভিতরে ডিপথিরিয়ার সাদা প্যাচ বেশ স্পষ্টই দেখা যায়।

ডিপথিরিয়ার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বাপ-মায়ের মুখের পরিবর্তন সতু বদ্যির খুবই পরিচিত। এত পরিচিত যে দিনের পর দিন সে বাড়িতে গিয়েও সতু বদ্যি বুঝতে পারেনি যে রোগীর বাবা মাও তার পরিচিত।

ডিপথিরিয়া রোগটা মোটেই সুবিধাজনক নয়, চিকিৎসাটা অবশ্য লাইন বাঁধা—সিরাম দাও—ভিট্যামিন দাও—পেনিসিলিন দাও, হৃৎপিণ্ডের দিকে নজর রাখো ইত্যাদি। কিন্তু মুশকিল হল এই যে ওদের কখন যে হৃৎপিণ্ড হরতাল করবে কিংবা জন্মের মত খুঁতে হয়ে থাকবে আর কখন যে কোন্ মাংসপেশী পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে পড়বে তা বোঝা প্রায় দুষ্কর।

'কোন্ রোগটা বেশ সুবিধাজনক বলতে পারেন, ডাক্তারবাবু?' প্রশ্ন করেন বাতগ্রস্ত জজ হয়ে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ মুন্সেফ।

'আপনাদের পক্ষে কোন রোগই নয়। তবে আমাদের পক্ষে সেই সব রোগই সুবিধাজনক যাতে রোগও না সারে আবার রুগীও না মরে—যেমন ধরুন আপনার বাত।' সতু বদ্যি উত্তর দেয়।

শ্রোতাদের হাসির ভিতরে সতু বদ্যি শুরু করে।

হ্যাঁ, আর ডিপথিরিয়ার চিকিৎসায় অর্থের প্রয়োজন প্রচুর। তবে সতু বদ্যি চেষ্টা করলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারে বাচ্চাটাকে।

কিন্তু না শিশুর মা শিশুকে ছেড়ে থাকবে না। সর্বস্বান্ত হলেও না।

রোগগ্রস্ত শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা সাফ জবাব দেয়।

সুতরাং আর সব বাবার মত রোগীর বাবাও শিশুকে হাসপাতালে পাঠাতে রাজী হন না। কি করে হবেন? কি করে শিশুর মায়ের চোখের জল পেরিয়ে নিয়ে যাবেন বাচ্চাকে?

শিশুর মায়ের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শিশুর বাবা বলেন, 'তাই হবে। বাড়িতেই চিকিৎসা হবে ওর। কান্নাকাটি করো না। তাহলে তোমার খুকু যে ঘাবড়ে যাবে।'

সুতরাং সতু বদ্যি চিকিৎসা শুরু করে।

শিশুর ডিপথিরিয়া শেষ পর্যন্ত সেরে যায়। নাড়ীর গতি আর শরীরের উত্তাপ সাধারণ স্তরে নেমে আসে। রোগীর গলার সাদা পর্দা আর মায়ের গলার সরু হারও মিলিয়ে যায় প্রায় এক সঙ্গেই।

শেষ পর্যন্ত একদিন সতু বদ্যি বলে তাকে আর খবর দেবার প্রয়োজন নেই, রোগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

রুগীর বাবা আনন্দের আতিশয্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমা মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে জোরে একটা সিটি বাজিয়ে দেয়। তারপর মেয়েকে বলে, 'বুঝলি উচ্চিংড়ে এ-যাত্রা তুই

বেঁচে গেলি।'

ওই সিটিতে সতু বক্সি শেষ পর্যন্ত চিনতে পারে রুগীর বাবাকে—আর মাকেও। হ্যাঁ, এরাই তো এসেছিল কয়েক বছর আগে সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট করার চেষ্টায়।

এই তো সেই পাড়ার ছোকরা বৌ-ঝিদের দেখলে যে এই ভাবেই সিটি বাজাত। এতদিন সতু বক্সি চিনতে পারেনি। পারবেই বা কি করে বলুন।

মৃত্যুপথযাত্রী শিশুর মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়া আর মা-দুর্গার মাথায় হাত বুলিয়ে কাটলেট খাওয়া এর ভিতরে মিল কোথায় বলতে পারেন? ফিরে যেতে যেতে সতু বক্সি আবার জাঁকিয়ে বসে। আড্ডাবাজ লোক তো গল্পের গন্ধ পায়।

মধ্যবিত্ত ঘরের অল্পশিক্ষিত অকর্মা ছেলেদের সতু বক্সি ভালো করেই চেনে। তারা ছোট কাজ করে না, কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা বড় কাজ করেছেন। আর বড় কাজ পায় না যোগ্যতা নেই বলে। তারপর কর্মহীন মগজে শয়তানের কারখানা গজিয়ে ওঠে প্রকৃতির নিয়মেই।

তারা রক থেকে রকান্তরে ঘোরাফেরা করে স্বাভাবিক ভাবে প্রকৃতির নিয়মে। আবার সতু বক্সির সঙ্গে ছোকরার প্রথম আলাপের কারণও ঘটেছিল পরিচিত প্রকৃতির নিয়মেই।

কিন্তু সেই রকের সিটি থেকে এই সিটি যে অনেকদূর। ছোকরা কি করে এল এতটা পথ? হ্যাঁ, গল্পের মত গল্পই বটে।

সেই যে-সময় ও সতু বক্সির কাছে প্রথম গিয়েছিল ওরও প্রথম পরিবর্তন শুরু হয় সেই সময় থেকেই। এর আগে কোন ভাবনা-চিন্তার বালাই ওর ছিল না। বাড়িতে ভালো হোক মন্দ হোক দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পেত। সব রকম হাত খরচা দেবার মত আর্থিক অবস্থা বাড়ির ছিল না। তা নাই বা থাকল। বারোয়ারী পূজো ছিল, ভ্যারাইটি ফাংশান ছিল—হাত খরচা চলে যেত। শুধু কি হাত খরচা? মখমলের কর্ডের প্যান্ট, শার্কস্কিনের হাওয়াইয়ান শার্ট এসবও মাঝে মাঝে হত।

সময় কাটছিল যেন পালেদের করাত কলের কাঠ। বছরে আধ ডজন বারোয়ারী, কোয়ার্টার ডজন ফাংশান, শীতকালে ক্রিকেট ম্যাচ, গরম কালে ফুটবল ম্যাচ এ যেন হাল্কা হাওয়ায় পাল-তোলা ময়ূরপঙ্খী নাও।

মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়ও হয় অমনি খেলার ভিতর দিয়েই। বারোয়ারী পূজোর

নৈবেদ্য সাজানো নেহাৎই ঘটনাচক্র ছাড়া আর কিছু নয়।

বেশ সপ্রতিভ ছেলেটি—গল্প বলে আদায় করতে হয় না।

তারপর যখন সতু বস্তির খপ্পরে গিয়ে পড়ল সে অবস্থার গুরুত্ব তখন ও বোঝেনি। কিন্তু বুঝেছিল এ অবস্থার যা সাধারণ পরিণতি তা হল বিবাহ। সে বড় মুশকিল। উঃ সারাদিন ঘানি টানা কেন? না বৌ ছেলেকে খাওয়াতে হবে। সকাল বেলা উঠে থলি নিয়ে বাজার করা কেন? না বৌ তো ঘরের কাজ করবে তার পক্ষে কি আর বাজার করা সম্ভব হবে? তাছাড়া মেয়েদের বাজার যাওয়া কি আর আমাদের দেশে চলে?

বাজার থেকে লাউ এনে চিংড়ি মাছ না আনলে আবার ছুটতে হবে চিংড়ি মাছ আনতে। মাংসের সঙ্গে পেঁয়াজ না আনলে আবার ছুটতে হবে পেঁয়াজ আনতে।

আর তা ছাড়া ছোকরার জন্যে কাঁদবে না? চৌমাথার রক কাঁদবে না? রকের ছেলেরা কাঁদবে না? বারোয়ারী পুজোর সময় মা দুগ্‌গা কাঁদবেন না?

ওদের বন্ধু বোদের বিয়ে হল ও বছর। ওই তো বোদেকে ঠাট্টা করেছে। ও নাকি চোখ বুজে দেখতে পেরেছে দু-বছর পরের অবস্থা।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে বোদে। তার পাশে ঘোমটা মাথায় কলা বৌ, তার কোলে একটি বাচ্চা। বোদের কোলে একটি আর ডান হাত ধরে আর একটি বাচ্চা। বাস দেখে দূর থেকে যেন বোদে চ্যাঁচাচ্ছে—গলাটা বকের মত উঁচু করে চ্যাঁচাচ্ছে—'বাঁধকে'। গলা উঁচু করেছে কারণ হাত উঁচু করে দেখাতে গেলে ছেলেটা যদি হাত ফসকে পালিয়ে যায়?

হ্যাঁ, তাইতে ও ঠিকই করেছিল। মাগনা ফুর্তি করতে গিয়েছিল—তা একটা গোলমাল বেঁধেই যখন গিয়েছে কি আর করা যাবে—কিছু পয়সা গুনাগার দিয়ে বেরিয়ে এলেই হবে।

কিন্তু গোলমাল বাঁধালো মেয়েটি। না, তেমন কিছু তত্ত্বকথা বলেনি। তেমন কিছু কি কোন তত্ত্বকথাই বলেনি। এমন কি গালাগালও করেনি। খালি মাঝে মাঝে সস্তা এসেন্স মাখা ছিটের রুমাল চোখে দিয়ে কেঁদেছে। মাঝে মাঝে বলেছে ওকে নাকি ছেলেটিকে বড় ভালবাসে। মাঝে মাঝে বলেছে বাচ্চাদের নাকি ভারি ভালো লাগে ওর। এই রকম আর কি।

আর তাইতে মনটা যেন কিরকম দুর্বল হয়ে গেল ছোকরার। ঠিক ভালবাসা

কাকে বলে তা ও বোঝে না। তবে হ্যাঁ মেয়েটির পাশে দাঁড়ানো, ওকে সাহায্য করা,ওর আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথী হওয়া—মানে ঠিক যে ভালো লাগতো তাও নয়—তবে না হওয়া কি রকম খারাপ লাগতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত বিয়েই করতে হল তাইতে।

ঠিক দুগ্‌গা ঠাকুরের ভাসানের সময় শেষ মুহূর্তে চোখ বুজে প্রতিমা জলে ফেলে দেবার মত—।

কিন্তু তারপর সমস্যা হল আর্থিক। বৌ চাকরি করত, মাইনে কিন্তু মোটে ৫০৲ টাকা। আর তাছাড়া বিয়ে করাতে বাড়ি থেকেও দিয়েছে তাড়িয়ে। তাইতে অর্থকষ্টে প্রথম দিকে বড্ড বেশী ভুগেছে। কিন্তু তারপর কালি ঝুল মেখে গাড়ির ক্লীনার মেকানিক থেকে শুরু করে—আজ ও ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়েছে। নিজের ট্যাক্সি নয় যদিও—তবুও মাসে ২০০।২৫০৲ টাকা রোজগার হয়।

কালি মাখতে খারাপ লাগত না ছোকরার?

লাগত কিন্তু পোয়াতী বৌকে অযত্নে পালিত হতে দেখতে আরও খারাপ লাগত।

ফি পকেটে করে সতু বস্তি রাস্তায় বের হয়।

ভাঙতে ভাঙতে জুড়ে গেল এই পরিবারটি। সম্ভাবনা থেকেই ওই ডিপ-থিরিয়ায় ভুগে ওঠা শিশু যেন একসূত্রে বেঁধে রেখেছে এই পরিবারকে।

কিন্তু তারপরেই মনে ভেসে ওঠে সন্দেহের ছায়া। ওই ছোকরা কি থাকবে সারা জীবন বিশ্বস্ত স্বামী আর কর্তব্যপরায়ণ পিতা হয়ে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বেবী ট্যাক্সি চালিয়ে মাসের শেষে দুশো আড়াইশো টাকা উপার্জন করে সারা জীবন কি এই ভাবে সংসার প্রতিপালন ও করবে?

ওর অতীতের মুক্ত জীবন—রকের আর বারোয়ারীর, ভ্যারাইটি ফাংশানের আর সিনেমার—তারা কি ওকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকবে না? আর সে ডাকে কি চিরকালই ও বধির থাকবে?

এই সব চিন্তা সেদিন ছিল। আজও ছিল। মনের কোণে চাপা পড়েছিল। কিন্তু আজ যখন সতু বস্তি আর বস্তিগিন্নীর হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে দোল খেতে খেতে সতু বস্তির খুকু রাস্তায় বেরিয়েছে—ঠিক তখন সতু বস্তি সামনে দেখল—হ্যাঁ, সেই ছোকরা!

সতু বস্তির ডিপথিরিয়া রুগী চলেছে বাপ মায়ের হাত ধরে লাফাতে লাফাতে।

সতু বক্সি দেখে—বাপকে দেখে—বাপ তাকায় মেয়ের দিকে—মেয়ের মায়ের দিকে। সতু বক্সির দিকেও একটু মিষ্টি হেসে নমস্কার করে।

সতু বক্সি মাকে দেখে। মা তাকায় মেয়ের দিকে—মেয়ের বাবার দিকে। সতু বক্সির দিকেও মিষ্টি হেসে নমস্কার করে।

না, জাত বক্সির ভুল হয় না। এবার সতু বক্সি নিঃসন্দেহ হয়। এ পরিবার আর কেউ ভাঙতে পারবে না। ডিপথিরিয়াও না—রক পঞ্চায়েতও না। সোনার শিকলে বাঁধা পড়েছে ওরা। কিন্তু সমস্যা তো তা নয়, সতু বক্সি স্বগতোক্তি করে শ্রোতাদের সামনে—সপ্রশ্ন স্বগতোক্তি।

সামান্য একটা শিশুর এতটা ক্ষমতা কী করে হয়। আর আশ্চর্য সে ক্ষমতার খবর সতু বক্সি রাখতই না—। সত্যিই আশ্চর্য।

'তা রাখবেন কেন ?' খেঁকিয়ে ওঠেন বাত রোগগ্রস্ত জজ্ হয়ে রিটায়ার করা মুন্সেফ।

এসব তিনি আগেই জানেন, সন্তানের ক্ষমতা যে কত বেশী তা তিনি কেন এদেশে সবাই জানে। ভদ্দরলোক চাষা ভুষো—কুলি মজুর মায় সতু বক্সিরও জানা উচিত একথা, তারা যখন এদেশের লোক তখন এতে আর প্রশ্ন কি ?

কেন মহাভারতে আদিপর্বে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলেনি ? সতু বক্সি জানবে কি করে ? দু-পাতা ইংরেজি পড়ে কবরেজ বংশের ছেলে পাকা সাহেব হয়েছে যে। জজ্ সাহেব ক্রমশই গরম হতে থাকেন।

তা বটে। সতু বক্সি সব অপরাধই কবুল করে নেয়। আর তাতে দোষই বা কি বলুন তো ? ধরুন বাংলাদেশে তো সত্যিকারের সাহেব বলতে আছেন এক ডাক্তার সাহেব আর মিঞা সাহেব। সুতরাং তাতে আর দোষ কি ? কিন্তু মহাভারতে কি লেখা আছে ?

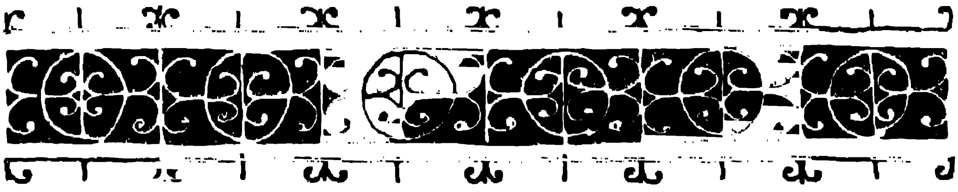
'কেন জজ্ সাহেব কি আর সাহেব নয় ?' জজ সাহেব খেঁকিয়ে ওঠেন।

হ্যাঁ, মহাভারতে ভরত-জননী শকুন্তলা বলছেন :

> পুন্নামোনরকাৎ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ
> তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্ত স্বয়মেব স্বয়ম্ভুব ॥"

অর্থাৎ কিনা—পুৎনামক নরক থেকে ত্রাণ করে বলেই তো পুত্রকে পুত্র বলে। সুতরাং ও ছোকরাকে যে ওর সন্তান সামান্য শহুরে নোংরামি থেকে উদ্ধার করেছে এ আর বিচিত্র কি ?

জজ হয়ে রিটায়ার করা মুন্সেফের রায় শেষ হয়।



রাজারানী মার্কা

বস্তিগিন্নী সভ্য সংস্কৃতিসম্পন্না মেয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে কালচার্ড। সুতরাং অভাবের কথা যখন বলে বড মিষ্টি করে বলে। হয়তো বলে, ফুলের মত সুন্দর শিশুকে ভালো প্যারাম্বুলেটারে কিরকম সুন্দর মানায় কিংবা হয়তো বলে প্যারাম্বুলেটারে করে বেড়ানো কোলে করে বেড়ানোর চাইতে অনেক বিজ্ঞানসম্মত।

কিংবা ধরুন শিশুদের যখন বাডতি বয়স তখন তাদের উপযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন—খুবই প্রয়োজন কিন্তু শুধু তো শরীরের খাদ্য দিলে হয় না মানসিক খাদ্য দিতে হয়। ধরুন সুরের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে বাড়িতে রেডিও থাকা দরকার, গ্রামোফোন থাকা দরকার। বস্তিগিন্নী নিজের বিলাসের জন্যে এসব চাইছে না কিন্তু ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে তো এসব প্রয়োজন। আর যদি গ্রামোফোন থাকে তাহলে ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতা থেকে মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য পর্যন্ত সব কিছুর সঙ্গেই কত সহজে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়।

সতু বস্তি এসব বোঝে কিন্তু আরো ভালো করে বোঝে আর্থিক অভাবটা। আর বস্তিগিন্নীর রুচিজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে যায়। ধরুন রত্নাকরের মায়ের কিংবা স্ত্রীর যে সব ভাষা তা তো বস্তিগিন্নী পড়েছে। না পড়ে উপায়ই বা কি, শাশুড়ীকে পড়ে শোনাতে হয়। রত্নাকরের মা বলছেন—

জননী কহিছে ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে আমার॥
দশমাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায়॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেঁট কৈল।
পত্নীর নিকটে গিয়া সকল কহিল॥

তারপর ধরুন রত্নাকরের স্ত্রীর ভাষা—

শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি ॥
*　　*　　*　　*
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্বদা করিবে মম রক্ষণ পোষণ।
আর যত পাপ-পুণ্যভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থে পাপ ভাগ না লাগে আমারে ॥

কিন্তু বস্তিগিন্নীই বলুন আর বস্তিগিন্নীর শাশুড়ীই বলুন এত সোজাসুজি কথা বলে না। বস্তিগিন্নীর শাশুড়ী কখনই বলেন না বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ভরণ-পোষণের কিংবা ধর্মাচরণের আর্থিক দায়িত্ব সতু বস্তিরই। কিন্তু তিনি তাঁর ধর্মাচরণ পরিত্যাগ করার সময় পরম স্নেহে সতু বস্তিকে স্মরণ করিয়ে দেন সতু বস্তির আর্থিক কষ্টে যে ধর্মাচরণ সে ধর্ম না করলেও চলবে। শাশুড়ী বৌএর এই সহৃদয় অনুগ্রহ সতু বস্তির যেন আরও বেশী করে বাজে।

সত্যি অক্ষম পুরুষ সবারই কৃপার পাত্র। অথচ পুরুষ মানুষ ভালবাসা সহ্য করতে পারে, হিংসা সহ্য করতে পারে, দ্বেষ সহ্য করতে পারে কিন্তু কৃপা করুণা এ সব বরদাস্ত করতে পারে না।

সতু বস্তির দোষ কি? ডাক্তারখানায় তো পরিশ্রম করতে কসুর করে না। যে রুগী আসে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যে রুগী যেখানে যেতে বলে যত দুর্গমই হোক সেখানে যায়। কিন্তু কোথায়, তা সত্ত্বেও তো সতু বস্তির অভাব মেটে না।

তাইতে সেদিন সকালে ডাক্তারখানায় আলোচনার সময় সতু বস্তির মনের যেন ঠিক তন্ত্রীতেই ঘা পড়ে। আলোচনা করতে এসেছিলেন চিকিৎসক সংঘের একজন নেতৃপদপ্রার্থী উৎসাহী কর্মী। তাঁর যুক্তিগুলো অকাট্য। ডাক্তাররা মানুষের সেবা করে। দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব বহন করে। শিশুর জন্ম থেকে বৃদ্ধের মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে তাদের সাহায্য প্রয়োজন হয়, গ্রহণও করা হয় অথচ তাদের কাজের গুরুত্বের তুলনায় পুরস্কার কত কম। অধিকাংশ ডাক্তারই এত কম অর্থোপার্জন করেন যে পরিবারের ভরণ পোষণ করে নিজের ছেলেমেয়েদের নিজের স্তরে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তারা অক্ষম।

অনেকে বলবেন, চিকিৎসকরা সমাজের সেবা করে। এর জন্যে তাদের অর্থের প্রত্যাশী হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে রোগাতুর দরিদ্রের সেবার সময়ে। কিন্তু সে চিকিৎসকেরও যে ভরণ পোষণ প্রয়োজন আছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় কি? আর তা ছাড়া দরিদ্রের প্রশ্নই যদি তোলা হয় তাহলে কই মুদিখানায় দরিদ্র বলে বিনে পয়সায় জিনিস দেয় না, কাপড়ের দোকানে দরিদ্র বলে তো বিনা পয়সায় কাপড় দেয় না। চিকিৎসকরাই বা বিনা পয়সায় নিজেদের শ্রম দান করবেন কেন?

সতু বক্সির মনের তন্ত্রী সেদিন ঠিক এই ঘাটেই বাঁধা ছিল সেই জন্যে সমস্ত মন দিয়ে সতু বক্সি আগন্তুক চিকিৎসককে সমর্থন জানায়। না জানিয়ে উপায়ই বা কি? সতু বক্সি যেন চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছে বক্সিগিন্নী ঘাড় নেড়ে বলছে 'হাঁ তা তো বটেই, তা তো বটেই।' বক্সিগিন্নীর ছেলে মেয়েও যেন আধো আধো কথায় বলছে 'হাঁ তা তো বতেই তা তো বতেই।'

কিন্তু চিকিৎসক সংঘের এই আন্দোলনের অংশীদার হতে হলে প্রয়োজন সদস্য হওয়া। সদস্য হতে গেলেও আবার প্রয়োজন অর্থ কিন্তু অর্থের সেদিন সতু বক্সির বিশেষ অভাব। তাইতে সতু বক্সি চিকিৎসক বন্ধুটিকে বলে দু-দিন বাদে লোক পাঠালে সে টাকা দিতে চেষ্টা করবে। আর টাকা থাকলে সে তো খুশি হয়েই দেবে কারণ ঠিক এই রকম আন্দোলনের কথা সতু বক্সি নিজেও ভাবছিল।

এক পেয়ালা করে চা শেষ হবার পর কড়া দুপুরের রোদের ভিতরে ভদ্রলোক রওনা হন। আর সতু বক্সি রোদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে দু-দিন বাদে কি চাঁদা দেবার মত অর্থ থাকবে? তবে যদি নাও থাকে যে করেই হোক—ধার করে হোক আর ভিক্ষে করে হোক—অন্তত এই অর্থ সে সংগ্রহ করবেই। এই মূঢ় সংবেদনহীন সমাজের বিরুদ্ধে আঘাত করার মত যত ছোটই হোক না কেন একটা রাস্তা অন্তত সতু বক্সি পেয়েছে। সামনে দুপুরের রোদ বাড়তে থাকে। হালকা ধরনের ধুলোর ঝড় মাঝে মাঝে ওঠে, মাঝে মাঝে মিলিয়ে যায়। সতু বক্সি তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে—

এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি

তপস্বিনী—ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন উষায়—

না, তা ভাবে না। তবে হ্যাঁ বসন্তের কথা ভাবে—শেষ বসন্ত—শেষ বসন্তে নানা অসুখ হবে। বসন্তকাল সতু বদ্যির ভাষায় পক্স সিজন। জল বসন্ত হবে, আসল বসন্ত হবে, হাম হবে। হামের পরে নিউমোনিয়া হবে। রক্ত আমাশা হবে, কলেরা হবে। আর সতু বদ্যির অজস্র রুগী আসবে। তাদের কাছে টাকা পাবে। দু-চার টাকা নয় অনেক টাকা। আর চৈত্রদিনের তপ্ত বেলায় সতু বদ্যি আঁচল পেতে টাকা কুড়োবে। ধুলোর ভিতর দিয়ে চৈত্রের দুপুর বেলায় সতু বদ্যি দিবা স্বপ্ন দেখে—দেখে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া দিচ্ছে আর উজ্জ্বল গৌরবর্ণা তন্বী বদ্যিগিন্নী পলাশের মত লাল সিফন জর্জেট পরে এক হাতে মেয়ের হাত ধরে আর এক হাতে বিলিতি প্যারাম্বুলেটারে বাচ্চাকে শুইয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। দেখে সন্ধ্যে উৎরে গেছে—মৃদু নীল আলোয় ভরা ঘরে বদ্যিগিন্নী বসে আছে তার ছেলেপিলেদের নিয়ে। সামনে বিরাট রেডিওগ্রামে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজছে—রবীন্দ্রনাথের নিজের আবৃত্তি করা কবিতা বাজছে আর রকম বেরকমের ছড়ার গান বাজছে। দেখে কালো রঙের নতুন চকচকে গাড়ি তাতে চড়ে সতু বদ্যি রুগী দেখে বেড়াচ্ছে আর তারও পিছনে দেখে চারদিকে বাগান ঘেরা ঝকঝকে তকতকে করে গোছানো ছোট বাড়ি।

হঠাৎ রুগীর ডাকে চমক ভাঙে—কলেরা হয়েছে—সত্যিই কি যাদৃশি ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশি। সতু বদ্যি অবাক মেরে যায়। সেই গত বছর চৌধুরীদের বাড়ির বুড়ীর চিকিৎসা করেছিল সতু বদ্যি—বুড়ী বেঁচেও গিয়েছিল। সেই বুড়ীরই আত্মীয় সতু বদ্যির ডাক্তারখানা থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে শহরের বাইরে থাকে। প্রথমে বুড়ীর কথা বলতে সতু বদ্যি মনে করতে পারেনি কিন্তু ভদ্রলোক মনে করিয়ে দেওয়াতে পরে সে বুঝতে পারলো। সে এক মজার ব্যাপার হয়েছিল গত বছর। সে বুড়ীর বয়স ছিল ষাটের ওপর। দাঁত পড়ে গিয়েছে, চুলগুলো শনের নুড়ির মত হয়েছে। দুপুর বেলা থেকে পায়খানা আর বমি করছিল। সতু বদ্যি সেলাইন দেয়া শুরু করেছিল বেলা তিনটে থেকে। সে বুড়ী এক অদ্ভুত বুড়ী। সতু বদ্যি এক বোতল করে সেলাইন দেয় নাড়ীটা একটু ভালো হয়, বুড়ী দু-চারটে কথা

বলে। সতু বদ্যি সেলাইন বন্ধ করে। বুড়ীর দু-একবার দাস্ত হয়। ব্যাস নাড়ী চুপসে কাঠ। সতু বদ্যি আবার সেলাইন দেয়া শুরু করে—এই ব্যাপার চলে প্রায় রাত দেড়টা-দুটো অবধি। রাত্রি দুটো নাগাদ সতু বদ্যি আবার সেলাইন চড়িয়ে বারান্দায় এসে বসেছে গায়ে একটু হাওয়া লাগাবে বলে। ঘণ্টা বারো কলেরার সঙ্গে লড়াই করে তখন সতু বদ্যি বেশ পরিশ্রান্ত। এমন সময় বুড়ীর এক নাতি—বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে, সে এসে সতু বদ্যির পায়ের কাছে বিড়-বিড় করা শুরু করেছে 'ডাক্তার বাবু—অ ডাক্তার বাবু, রুগীটা বাচবো তো ? না বাচলে মহা মুশ্‌কিল। বুড়ীর বুড়া আবার এখানে নাই।'

সতু বদ্যি বলে, 'হ্যাঁ বাঁচবে।' বলে আবার ঝিমোয়। আবার আর একজন এসে জিজ্ঞাসা করে 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, বুড়ী বাচবো তো ?' সতু বদ্যি বলে, 'হ্যাঁ, বাঁচবে ভয়ের কিছুই নেই।' একটু বাদেই আবার আর একজন এসে শুরু করে, ডাক্তারবাবু, 'ডাক্তারবাবু বুড়ী বাচবো তো ?'

এইবার সতু বদ্যির মেজাজ খারাপ হয়। রেগে মেগে চেঁচিয়ে ওঠে 'বাঁচে তো বাঁচবে, না বাঁচে তো মরবে তাতে হয়েছে কি ? আদ্দিকালের বুড়ী তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে সে মরে গেলেই বা কি' এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে।'

যেই না বলা যে প্রশ্ন করেছিল সে তো পালিয়ে গেল কিন্তু পাশের ঘর থেকে আর একটা বুড়ী কুঁজো হয়ে শনের নুড়ির মত মাথাটা নাড়তে নাড়তে, ফোকলা মুখে ফ্যাস ফ্যাস করে কথা বলতে বলতে লাঠি ভর করে এসে হাজির হয় 'কেটা রে। আমার খুকীরে বুড়ী কয় কেটা ? যে কয় সে নিজে বুড়া তার চোদ্দ পুরুষ বুড়া।'

তাকে দেখে তো সতু বদ্যির আক্কেল গুড়ুম। মানে রুগী ঐ আদ্দিকালের বুড়ী সে হল তার খুকী অর্থাৎ কি না ইনি তাঁর 'মা'। পিছু হটতে পথ পায় না সতু বদ্যি। গড় হয়ে শেষে বুড়ীর পায়ে ধরে অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে সতু বদ্যি বলে 'আজ্ঞে না, কে বলেছে আপনার খুকীকে বুড়ী। আপনিই এখনও বুড়ী হননি আর আপনার মেয়ে তো কচি খুকী।'

আজকের কলেরা রুগী গত বছরের সেই কলেরা রুগীর আত্মীয়। গত বছর সেই মরণাপন্ন বুড়ীকে বাঁচিয়ে তোলাতে তাদের আত্মীয় স্বজন মহলে সতু বদ্যির ভারি পসার হয়েছে। তাইতে শহরের বাইরে পাঁচ মাইল দূরের কলেরা রুগী

হওয়া সত্ত্বেও সতু বদ্যিকেই ডাকতে এসেছে। সতু বদ্যি একটু ভেবে নেয়। এদের বাড়িতে কঠিন রুগী আর এদের বিশ্বাস সে রুগী সারাতে একমাত্র সতু বদ্যিই পারে। সুতরাং এদের কাছে টাকা আদায় করা সোজাই হবে। এরা এদের ক্ষমতার অতিরিক্ত অর্থব্যয় করতে কসুর করবে না।

সতু বদ্যি খুব অমায়িক ভাবে হেসে বলতে শুরু করে, হ্যাঁ, এরা তো তার খুব পুরনো পরিচিত মক্কেল। তার যাওয়াই উচিত—বিপদে যখন পড়েছে। কিন্তু মুশ্‌কিল হল তার বড্ড কাজ এখন। কলেরা রুগীর দায়িত্ব নিয়ে শহরের বাইরে যাওয়া মানে একদিন হোক দু-দিন হোক যতদিন না রুগীর বিপদ কেটে যায় সেখানেই পড়ে থাকতে হবে। শহরের সব রুগী ফেলে সতু বদ্যি কি করে যায়—অন্য রুগীরও তো স্বার্থ দেখতে হবে।

আগন্তুক ভদ্রলোক সতু বদ্যির বিনয়ে রীতিমত ঘাবড়ে যান। সুতরাং ফল সতু বদ্যি যা আশা করেছিল তাই হল। ভদ্রলোক প্রথমেই তাঁর অকাট্য যুক্তি দেখান—অন্য কার কি লোকসান হবে তা ভদ্রলোকের পক্ষে জানা যেমন সম্ভব নয়, সে লোকসান পুষিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু সতু বদ্যির যা লোকসান হবে সে লোকসান পুষিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত ভদ্রলোক নিশ্চয়ই করবেন। যত টাকাই লাগুক সতু বদ্যিকে যেতেই হবে। কলকাতা শহরে তো ডাক্তারের অভাব নেই। অন্য রুগীর অসুবিধা হলেও তারা মানিয়ে নেবেন। মোদ্দা কথা তাকে যেতেই হবে।

এইবার সতু বদ্যি খুব নিস্পৃহ নির্লোভ অমায়িকভাবে দর-দস্তুর শুরু করে, হ্যাঁ, সে যাবে তবে আড়াইশ টাকার কম নিলে সতু বদ্যির আর্থিক লোকসান হয়। অবিশ্যি তার ভিতরে ওষুধের দাম যাতায়াতের ভাড়া ধরা হবে না। আড়াইশ টাকা শুধু তার নিজের মজুরি।

ভদ্রলোকের মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আ—ড়া—ই—শ! গতবার তো সতু বদ্যি মোটে একশ টাকা নিয়েছিল। আর তাছাড়া ওরা খুব গরীব—অবস্থাপন্ন তো নন। ওরা কি পারবেন অত টাকা দিতে।

সতু বদ্যি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে—দিতে পারুন চাই না পারুন ভদ্রলোক দেবেন। ছেলের যখন কলেরা আর সতু বদ্যিকে যখন ধন্বন্তরী ঠাউরেছেন তখন টাকা না দিয়ে তার কোন উপায় নেই। তাইতে সতু বদ্যি পরম অমায়িক ভাবে ভদ্রলোকের সাহায্যে এগিয়ে যায়।

আড়াইশ টাকা দিতে যদি ভদ্রলোকের অসুবিধা হয় তাহলে অল্প খরচেও

বন্দোবস্ত করে দেয়া যেতে পারে। পাড়ায় আর একজন ডাক্তার আছেন, একটু জুনিয়ার—ওঁকে একশ টাকা কি তার কম দিলেও যাবেন। যদিও জুনিয়ার, কাজ তিনি খারাপ করেন না। ভদ্রলোক কি রাজী আছেন?

না, ভদ্রলোক রাজী নন। রাজী হওয়াও সম্ভব নয়। ছেলের যেখানে অসুখ আর কলেরার মত অসুখ সেখানে রুগী বাঁচানোর ষোল আনা নিশ্চয়তা প্রয়োজন। দৈবের হাতে তিনি এক আনাও ছেড়ে দিতে রাজী নন।

সুতরাং ভদ্রলোক টাকা দিতে রাজী হন। একশোটা টাকা এনেছিলেন সঙ্গে করে সেটা সতু বদ্যিকে আগাম হিসেবেই দিয়ে দেন। সতু বদ্যি তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছাতে লেগে যায়। আর ভদ্রলোক বেরিয়ে যান ট্যাক্সি আনতে। কলেরা রুগী তো—দেরি করা চলে না।

এ সব দরদস্তুরে সতু বদ্যি বেশ ওস্তাদই হয়ে উঠেছে। ভয়ার্ত লোককে আরও ভীতিগ্রস্ত করে অর্থ সংগ্রহ করতে সতু বদ্যির বিবেক একটুও দংশন করে না। কেনই বা করবে? সতু বদ্যি বলে স্বয়ং মনুই বলেছেন—

বৃদ্ধৌ চ মাতা পিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা মতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য শতং কৃত্বা ভর্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

বৃদ্ধ মাতা-পিতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু সন্তান এদের শত অপকর্ম করেও ভরণ পোষণ করা কর্তব্য। হিন্দুর ছেলে হয়ে মনুর নির্দেশ অমান্য করার মত দুঃসাহস সতু বদ্যির নেই। যাই হোক ভদ্রলোক ট্যাক্সি আনেন। কলকাতা শহরের ট্যাক্সিতত্ত্ব বোধহয় আপনারা জানেন। প্রথমতঃ আছে শহুরে ট্যাক্সি আর গাঁইয়া ট্যাক্সি। শহুরে ট্যাক্সিতে মার্কা থাকে ডাব্লু-বি-টি আর গাঁইয়া ট্যাক্সিতে মার্কা থাকে ডব্লু-বি-আর। ডাব্লু-বি-টি আবার দু-রকম। খোকা আর ধেড়ে। ডাব্লু-বি-আর কিন্তু শুধু ধেড়েই হয়। ধেড়ে বললে কম বলা হয় আসলে জরাগ্রস্ত চলৎশক্তিব্যাহত যে সমস্ত ট্যাক্সি তারাই ডাব্লু-বি-আর হয়ে মফস্বলের রাস্তায় যাত্রী বহন করে। ভদ্রলোক আবার জুটিয়ে আনলেন একটা ডাব্লু-বি-আর গাড়ি। সেই গাড়ির সিটের স্প্রিং ছাড়া সবই নড়বড় করে আর হর্ন ছাড়া সবই বাজে। হেন গাড়িতে সতু বদ্যি আর রুগীর বাবা মালপত্র সমেত উঠে বসে।

হরেক রকম আওয়াজ করতে করতে গাড়ি এগিয়ে চলে। কখনও গাড়ির আওয়াজ ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাড়িয়ে যায়। কখনও বা ইঞ্জিনের আওয়াজ বডির আওয়াজকে ছাড়িয়ে রাস্তা মাতায়। ক্রমে গাড়ি রেল লাইন ছাড়িয়ে

যায়। জমাট শহর ভেঙে শহরের উপকণ্ঠে চলে আসে। দুপুরের গলা পিচ আর আশপাশের বাড়ির দেয়াল আর আকাশ সব দিক দিয়েই আগুন ঠিকরে আসে। আস্তে আস্তে শহরতলী ছেড়ে যায়। দু-পাশে ফসল কাটা ক্ষেত, চষা ক্ষেত, চোত ফসলের ক্ষেত ছাড়িয়ে গাড়ি চলতে থাকে। হঠাৎ গাড়িতে একটা বিকট আওয়াজ হয়। সতু বক্সি বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়ে অলস ভাবে ভাবছিল।

ভাবছিল এমন সময় একটা বিকট ঘড় ঘড়-ঘড়াৎ আওয়াজ করে গাড়িটি বন্ধ হয়ে গেল। মাঠের মাঝে দুপুর রোদ্দুরে সতু বক্সি, রুগীর বাবা আর পাঞ্জাবী ড্রাইভার পথে দাঁড়াল। এখন উপায়!—ড্রাইভার গাড়ির ঢাকনা খুলে কি সব কারিগরি করে হ্যাণ্ডেল মারে, কিন্তু গাড়ি আর চলে না—ঢাকনা বন্ধ করে পাঞ্জাবী দাড়িতে হাত বোলায়। আবার সেল্‌ফ্‌স্টার্ট মারে,গাড়ি কাঁই কাঁই আওয়াজ করে কিন্তু চলে না। ড্রাইভার আবার ঢাকনা খোলে, আবার কি সব কারিগরি করে। শেষে বলে, গাড়ি ঠেলতে হবে। সতু বক্সি বলে, তার দু-মন দশ সের ওজন ছিল এখন আড়াই মন হয়েছে—গাড়ি ঠেলা তার দ্বারা সম্ভব হবে না। রুগীর বাবা একটি মনুষ্যরূপী পতঙ্গ, ঠেলতে তিনি রাজী আছেন কিন্তু পাঞ্জাবী বলে ঐ চিড়িয়ার তাগদে কিছু লাভ হবে না। তা হলে উপায়? দায় যদিও তিনজনেরই তবুও ঐ মনুষ্যরূপী পতঙ্গেরই দায়টা বেশী। সুতরাং তিনি পায়ে-চলা পথিকদের অনুরোধ করেন—তাঁর ছেলের বড় অসুখ। তিনি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছেন পথিকরা কি একটু ঠেলবেন? চোত ফসলের ক্ষেতে চাষীদের গিয়ে অনুরোধ করেন তাঁর ছেলের অসুখ করেছে ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা কি একটু ঠেলবেন? দূরে রাস্তা-মেরামত-করা কুলিদের কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন তাদেরও তো অনেকে বাবা, বিপদগ্রস্ত বাবাকে কি তারা সাহায্য করবেন না।

সবাই সাহায্য করেন। গাড়ির পিছনে একটা ভিড় জমে ওঠে। ক্ষেতের চাষী আর রাস্তার মজুর, রাজপথের পথিক আর রুগীর বাবা সবাই মিলে পিছন থেকে গাড়িটা ঠেলতে থাকে। গাড়ির সামনের সিটে বসে থাকে পাঞ্জাবী ড্রাইভার আর পেছনের সিটে আড়াই মনী সতু বক্সি। হরেক রকমের আওয়াজ করতে করতে গাড়িটি এগিয়ে চলে। গাড়ির বডিতে কাঁসর ঘণ্টা বাজে, ইঞ্জিনে তবলা মৃদঙ্গ বাজে, গাড়ি এগোয়—এই করতে করতে গাড়িটা হঠাৎ স্টার্ট নেয়। ভদ্রলোক মানে রুগীর বাবা কৃতজ্ঞতায় প্রায় গলে যান।

পকেট থেকে একমুঠো খুচরো টাকা পয়সা বার করে সবাইকে বকৃশিশ দিতে যান। কিন্তু কেউ নেয় না। ভদ্রবেশী পথিকরা ভ্রুক্ষেপ না করে একবার হয়তো 'ছিঃ' বলেন তারপর চলে যান। ক্ষেতের চাষী আর রাস্তার মজুরদের ভিতরে অনেকে হয়তো নিজেরাই বাবা অনেকে হয়তো ভবিষ্যতে বাবা হবার আশা রাখেন তারা কি করে বিপদগ্রস্ত বাবার কাছ থেকে পয়সা নেবেন। হোক্ না পিচগলা রাস্তা, হোক না চৈত্রদিনের তপ্তবেলা তা বলে কি এ ক্ষেত্রে পয়সা নেওয়া যায়। ভদ্রলোক লাফিয়ে গাড়িতে ওঠেন। আবার বিচিত্র আওয়াজ করতে করতে গাড়ি এগিয়ে চলে। এরই নাম হল ডাব্লু-বি-আর গাড়ি। ভদ্রলোকের বাড়ি শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে হলেও সেটা গ্রাম। আর গ্রামে কলকাতার ডাক্তারদের খাতির ঠিক যেন বাপের ঠাকুর। সতু বিদ্যি গরম জল চায়। পাড়ার চারটে ছেলে এগিয়ে আসে, ডাক্তারবাবুর কি চাই? সতু বিদ্যি এনামেলের প্যান চায় তো সাতজন পড়শী সাতটা প্যান এনে দেয়। আর সতু বিদ্যি যেন সেনাপতি—ছোট্ট গ্রামে পড়শীদের ছেলে, বুড়ো, বৌ, ঝি সবাই যেন সতু বিদ্যির আজ্ঞাবাহী সৈনিক। সেদিন দুপুর থেকে পরদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত চোদ্দ বছর বালকের জীবন মরণ সংগ্রামের সেনাপতি সতু বিদ্যি। সতু বিদ্যি ভয় পায় না কলেরাকে। অনেক রোগ ঘেঁটে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তার প্রচুর হয়েছে। তাছাড়া কলেরার ইনজেকশানও সে প্রত্যেক বছরই নেয়। পড়শীরাও ভয় পায় না। যদিও তারা ইন্‌জেকশান নেয় না। তারা সতু বিদ্যির সৈনিক—নির্ভিক সৈনিক। মলসিক্ত শয্যা মূত্রসিক্ত বসন সবই তারা নির্বিকার ভাবে পরিষ্কার করে। বিনয়ে নম্র হয়ে বিনা প্রশ্নে সতু বিদ্যির আজ্ঞা পালন করে।

পরদিন বিকেল বেলা রুগী প্রস্রাব করে। রুগীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। নাড়ীর গতির উন্নতি হয়। সতু বিদ্যি বলে, বিপদ কেটে গেছে। ছত্রিশ ঘণ্টা খাটুনির পর মৃত্যুর দরজা থেকে রোগীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসার সংগ্রামে সফল হওয়া মানে একটা জীবন রক্ষা করা। খুব বড় পুরস্কার এটা তবে আরও বড় পুরস্কার নগদ আড়াইশ টাকা।

ভদ্রলোকের কাছে সত্যিই আড়াইশ টাকা ছিল না। আর শুধু তো আড়াইশ নয়, ওষুধ বিষুধ গাড়ি ভাড়া নিয়ে আরও একশ। প্রায় দেড়শ টাকা কম পড়ে ভদ্রলোকের। দীন প্রশ্নভরা চোখে রুগীর বাবা সতু বিদ্যির দিকে তাকান, পড়শীদের দিকে তাকান। সতু বিদ্যির চোখে উত্তর মেলে না। মনুর উপদেশের

বিরুদ্ধে সতু বদ্যি যাবে না কিন্তু পড়শীরা উত্তর দেয়। ইস্কুলের ছেলের জমানো পুঁজি থেকে পয়সা, ডবল পয়সা আর আনি মিলিয়ে চার টাকা চোদ্দআনা বেরোয়। বাড়ির গিন্নীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর মাখানো নোটে আর টাকায় চল্লিশ টাকা বেরোয়। এমনি করে ঘণ্টাখানেকে সাড়ে তিনশ টাকার ঋণ শোধ হয়। বাজারের মোড় থেকে আবার ট্যাক্সি আসে। সেই ভাঙা ডাব্লু-বি-আর গাড়ি। পরম বিনয়ে সবার অভিবাদনের উত্তর দিয়ে সতু বদ্যি গাড়িতে ওঠে। রুগীর মা বলেন, সতু বদ্যি জীবন দান করেছে রুগীর। বিনয়ে সতু বদ্যি নুয়ে পড়ে। বলে 'জীবন কি কেউ দান করতে পারে! যার জীবন তিনিই দেন।' রুগীর বাবা বলেন, সতু বদ্যি সাক্ষাৎ ভগবান। সতু বদ্যি বলে, ভগবান তো সাক্ষাৎই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—সেই হিসেবে সতু বদ্যিও ভগবান, রুগীর বাবা-মাও ভগবান।

গাড়ি ছেড়ে দেয়। বসন্তের সন্ধ্যা নানা রঙে মাঠের ভিতর দিয়ে গাছের পাতায় আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রান্ত সতু বদ্যি পিছনের সিটের একটা কোণে হেলান দিয়ে ঝিমোয়। দক্ষিণের হাওয়া পিছন থেকে যেন তাড়া করে নিয়ে আসে। মায়ায় ভরা চোখ নিয়ে আধজাগা আধঘুমে সতু বদ্যি তাকিয়ে থাকে। গাড়ির ভাঙা ভাঙা শব্দ আর পকেটের খুচরো টাকা পয়সার আওয়াজ সব মিলিয়ে দক্ষিণের হাওয়ায় যেন গান করে।

বার্তা বাজিল পাতায়-পাতায় 'করো ত্বরা করো ত্বরা'
সাজাক পলাশ আরতি পাত্র রক্তপ্রদীপে ভরা
দাড়িম্ব বন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্ভ রক্তিম রাগে,
মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে মধুপের মনোহরা।

চারপাশের বসন্ত যেন হাতছানি দিয়ে সতু বদ্যির ঝিমন্ত মনকে ডেকে তোলে।

কিন্তু দক্ষিণের শিরেশিরে হাওয়া, আমের মুকুলের মাতাল-করা গন্ধ আর গাড়ির ঝম্ ঝম্ আওয়াজে ঐকতান ব্যাহত হয়। সতু বদ্যির পকেটে টাকার আওয়াজ।—এই টাকায় খোকার প্যারাম্বুলেটার হবে, রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড হবে। ঘরে পদকীর্তন বাজবে—

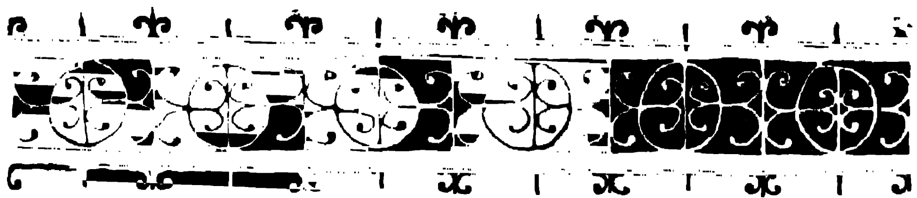
তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণী সমাজে।

আর পরশুদিন বন্ধুকে পাঠিয়ে দেয়া হবে পঁচিশ টাকা। দাবি আদায়ের সংগ্রাম তহবিলে।

বসন্তের মাতাল হাওয়ায় সতু বদ্যি আবার ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু খুচরো টাকা পয়সার ঝন্ঝনানিতে মাঝে মাঝে তাল কেটে যায় আর সতু বদ্যির ঘুম ভেঙে যায়। এই টাকার বাজনা বড় বেসুরো। হঠাৎ মনে হয় গাড়ির পিছনে দক্ষিণের হাওয়া, লাল শিমুল-পলাশের বন, ক্ষেতের চাষী, রাস্তা মেরামতের মজুর, রাজপথের পথিক, রুগীর পড়শী—সব যেন সতু বদ্যিকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। আর সতু বদ্যির গাড়ির আওয়াজ যেন খুচরো টাকা পয়সার আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে—এগিয়ে চলেছে ওদের ছাড়িয়ে। ঝিম্ ঝিম্ করে তালে তালে বসন্তের সুরে আবার গান হয়—

রাজারানী মার্কা
নোট গিনি টাকা
দুনিয়াকে বোকা
বানিয়েছে।
গোলাকার টাকার সুর কী মিষ্টি,
মন ভুলে যায় করিলে দৃষ্টি
কোন্ বিধাতা করেছেন সৃষ্টি
ট্যাঁকশালে টাকার গাছ আছে।

আহা, ট্যাঁকশালে টাকার গাছ আছে!



অথ শৃগালঘটিত

সতু বদ্যির চোখে দুটো পলক পড়লো। বাঁ দিকের চোখ এবং ঠোঁট দুটো চেপে সামান্য আওয়াজ বেরুলো। সাঙ্কোপাঞ্জা যেন মেসিন। একটা এলুমিনিয়ামের বড় বাটি নিয়ে এল। ছুরি কাঁচি ছুঁচ সব সুদ্ধ। ব্যাস্, হিটারে দিয়ে সব শুদ্ধ চাপিয়ে দিল ফুটতে। তারপরে এসে বসলো বাচ্চাটার চেয়ারের পাশে। বাচ্চার মাকে বললো, হাত দুটো ধরুন। তার পরে কাটা ঠোঁট দুটো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী দিয়ে জোরে চেপে বসে রইল। ছেলেটা চিৎকার করছে। সাঙ্কোপাঞ্জার ভ্রূক্ষেপ নেই। ছেলেটার দু-বছর বয়স হলে কি হয় যেন বিষ পিঁপড়ে। মা হাত চেপে ধরেছে তো কি হয়েছে। সাঙ্কোপাঞ্জা ঠোঁট চেপে ধরেছে তাতেই বা কি হয়েছে। ছেলেটি পা ছুঁড়তে থাকে। চেষ্টা করে পা দিয়ে ঠেলে সরে যেতে আর খানিকটা পারেও। রোগা পটকা আঠারো-উনিশ বছরের মা তো। তার ওপরে ছেলের ঠোঁটের রক্ত দেখে ঘাবড়েও গেছে সে সুতরাং একটা হাত ফস্কে যায় ও ছেলেটা লাফিয়ে ওঠে। আর যাবে কোথায়। সাঙ্কোপাঞ্জা জোর ধমক লাগায় 'বার্লি খান না ভাত খান? বাচ্চাটাকে ধরতে পারেন না?'

মা বেচারা থতমত খেয়ে বাচ্চাটাকে আবার ধরে।

সতু বদ্যি কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে ভিতরের ঘরে অন্য রুগী নিয়ে ব্যস্ত আছে। আস্তে আস্তে সাঙ্কোপাঞ্জা শুরু করে ব্যবসায়িক কথা। 'এই যে বাচ্চাটির ঠোঁট কেটেছে দেখছেন, ডাক্তারবাবুর হাতে পড়লে এমন ভাবে জুড়ে দেবেন যে পরে আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন না যে ওখানটায় কেটেছিল। কিন্তু পঁচিশ-তিরিশ টাকা খরচা হবে। সেটা আপনাদের আগেই জানিয়ে রাখা উচিত।' স্বল্পাভরণ তরুণী মায়ের হাতের দিকে তাকিয়ে সাঙ্কোপাঞ্জা কথা বলে।

টাকার অঙ্ক শুনে শ্যামবর্ণ মায়ের মুখের রঙটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 'এত টাকা!'

সতু বদ্যি সহৃদয় বলে পাড়ায় সুনাম আছে। আর শুধু সহৃদয় বলে নয় সুচিকিৎ-সক বলেও খ্যাতি আছে। সেই ভরসাতেই বেচারা এসেছিল সতু বদ্যির কাছে কিন্তু টাকার অঙ্ক শুনে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এত টাকা!

সঙ্গের ভদ্রলোক খোকার কাকা-টাকা হবেন হয়তো। বিনে আপত্তিতে তিনি সাঙ্কোপাঞ্জার দাবি মানতে রাজী হন না।

'কেটেছে তো একটু ঠোঁট। দেবেন তো সামান্য একটু আইডিন না হয় বেনজিন, বড় জোর একটু সেলাই। তার জন্যে পঁচিশ-তিরিশ টাকা কি করে খরচ হয়? আর এ কাজ তো সবাই করতে পারে। এত টাকা যদি খরচই হয় তা হলে কলকাতা শহরে কি আর ডাক্তার নেই না হাসপাতাল নেই। আমাদের তো আর জল বেচা টাকা নয়।'

জলবেচা টাকা শুনে সাঙ্কোপাঞ্জার হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেও রেগে গিয়ে বলে, 'আছে বই কি। কলকাতা শহরে পাঁচ হাজার ডাক্তার আছে পাঁচশ হাসপাতাল আছে। সেখানে গেলেই পারতেন, কেন এসেছেন সতু বদ্যির কাছে? সতু বদ্যি বাজিয়ে কাজ দেবে বাজিয়ে পয়সা নেবে।'

একটু বচসাই হয়। ভদ্রলোকও 'যাবোই তো' বলে, বাচ্চাটিকে কোলে তুলতে যান। সাঙ্কোপাঞ্জা রেগে আগুন হয়ে যায়। 'আচ্ছা কঞ্জুস তো আপনারা, পয়সা দেবেন না তো দেবেন না, তা বলে এত কষ্ট করে হাত দিয়ে চেপে রক্ত পড়া বন্ধ করে এনেছি আবার রক্ত পড়া শুরু করালেন। কোথাকার বেআক্কেলে লোক মশাই আপনারা? বসুন, বাচ্চার রক্ত পড়া বন্ধ হলে নিয়ে যাবেন বাচ্চাকে। পয়সা নেব না আমরা তার জন্যে। রক্ত বন্ধ হলে গিয়ে ডাক্তার, মুচি, পরামানিক যাকে দিয়ে খুশি সেলাই করিয়ে নেবেন।' ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে বসে পড়েন।

সাঙ্কোপাঞ্জাও বাচ্চার ঠোঁট দুটো চেপে ধরে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তারপরে বলে, 'আগে আগে ডাক্তারবাবু আপনি যা বললেন—একটু আইডিন একটু বেনজিন একটু সেলাই এই করে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু বছর তিনেক আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকে ডাক্তারবাবু একটু সাবধান হয়ে গিয়েছেন। সেই জন্যে এখন এই বাচ্চার ঠোঁট—ধরুন যদি ডাক্তারবাবু মেরামত করেন তা হলে ইনজেকশান দিয়ে জায়গাটা অসাড় করে নেবেন। তারপরে ভিতরের মাংস থেকে ওপরের চামড়া পর্যন্ত

পর্দায় পর্দায় রকম রকম সুতো দিয়ে সেলাই করবেন। তারপর ব্যাণ্ডেজ করবেন। তা ছাড়া ধনুষ্টংকার বিরোধী ইনজেকশান দেবেন, সাত দিন ধরে পেনিসিলিন দেবেন তারপরে সেলাই নিজের হাতে কেটে দেবেন। ডাক্তারখানা থেকে খরচই হবে বোধ হয় পনেরো-ষোল টাকা। আর এতদিন খেটে দশ-পনেরো টাকা মজুরি কি আর ডাক্তারবাবু নেবেন না। কি ঘটনা থেকে ডাক্তারবাবু এত সাবধান হয়েছেন জানেন?'

সাঙ্গোপাঙ্গা গল্প শুরু করে। খোকার কাকা ভুরু কোঁচকানো বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে শোনেন। খোকার মা ফ্যাকাশে শ্যামলা রঙের মুখ নিয়ে শোনে আর রক্তাক্ত হাত নিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গা গল্প করে।

বছর পাঁচেক আগে আমাদের ডাক্তারখানায় এক রুগী এল। এখানেই কোন কলে কারখানায় কাজ করে। বর্ধমানে বাড়ি। জাতে আগুরী যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে উগ্র ক্ষত্রিয়। এসে ডাক্তারখানায় ঢুকলো। ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢুকলো। ডাক্তারবাবুর টেবিলে দশটা টাকা রাখল। তারপর তার অনুরোধ জানালে।

ছোকরার মাথার বাঁ দিকে কানের ঠিক ওপরে ইঞ্চি তিনেক জায়গা জুড়ে চুলহীন খানিকটা চামড়া। আর সেই চুলহীন জায়গাটা এবড়ো খেবড়ো ভাবে ক্ষত বিক্ষত। ক্ষতটা সেরে গিয়েছে অনেক দিন—হয়তো দশ-বিশ বছর আগে। কিন্তু জায়গাটা বিচ্ছিরি রকম এবড়ো খেবড়ো হয়ে আছে। ছেলেটির অনুরোধ ঐ এবড়ো খেবড়ো জায়গা অস্ত্র করে পালিশ করে দিতে হবে। সতু বদ্যি কি তা পারবে?

সতু বদ্যি সব সময়েই সোজা কথার লোক। তাইতে সতু বদ্যি বল্লো, 'দেখ বাপু ইংরেজিতে একে বলে প্লাস্টিক অপারেশন। বাংলায় একে বলে খোদার ওপর খোদকারী। এ করতে গেলে জায়গাটাকে অসাড় করতে হবে। অনেকক্ষণ খাটতে হবে। অনেক রকম যন্ত্রপাতিও লাগবে। সুতরাং হাসপাতালে যাওয়াই ভালো। সেখানে এ সব কাজ করার জন্যে ভালো ডাক্তার আছে। সব রকম যন্ত্রপাতিও আছে।'

ছেলেটি কিন্তু হাসপাতালে যেতে রাজী নয়। সে নাকি অনেক হাসপাতালে চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা বলে যে-সব রুগীর জীবন মরণ-সমস্যা সেই সব রুগীরই হাসপাতালে স্থান হয় না। কাজেই এইসব দৈহিক সৌন্দর্যের জন্যে বিছানা আটকে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার তো আর জীবন মরণ সমস্যা

নয়। এখানে সমস্যা হল সৌন্দর্য বৃদ্ধির। আবার অনেক হাসপাতাল হেসেছে। করে তো কারখানায় কাজ, পরনে তো খাকী পোশাক, থাকে তো বস্তিতে— তার আবার এত সৌন্দর্য বোধ! এ যেন চটি জুতোয় ফিতে লাগানো। আবার অনেক হাসপাতাল বলেছে বিনি পয়সায় এসব অপারেশন হয় না, যদি কেবিন নিতে পারে তাহলে হতে পারে। তার মানে পাঁচশ টাকার ধাক্কা অর্থাৎ ছোকরার সাত-আট মাসের মাইনে। তাইতে এখন সতু বদ্যি যদি কিছু করতে পারে। সে তো গরীবের মা-বাপ। ভালো করে দেখে সতু বদ্যি রাজী হয়ে যায়।

পরদিন অস্ত্র করা হয়। প্রথমে নোভোকেন ইনজেকশান দিয়ে সারা জায়গাটা অসাড় করে নেয়া হল। তারপরে ছুরি দিয়ে আস্তে আস্তে কেটে কেটে চামড়া আর তলার মাংসকে উঁচু করা হল। চামড়ার মুখগুলোকে কেটে কেটে কাঁচা মুখ করা হল। তারপর সেলাই করা। কিন্তু এই হ্যাঙ্গাম করতে করতে ইনজেকশানের কাজ গেল শেষ হয়ে ফলে অসাড় জায়গায় আবার সাড় ফিরে এল। কিন্তু লোকটি অদ্ভুত। কাঁচা মাংসের ভিতরে যখন কাজ করা হচ্ছে সে মাংসে যখন সাড় ফিরে এসেছে তখনও লোকটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলো না। দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইল। সতু বদ্যি অপারেশন শেষ করলো। তার পর সাঙ্গোপাঙ্গাকে বললো পশ্চিম বাংলায় বদ্যিরাও বামুন তাদেরও অনেকের পদবী ঠাকুর। আর ঠাকুর বলতে বাংলা দেশে তো বামুনদেরই বোঝায়। আর বিহারে ঠাকুর বলে পরামানিককে কিন্তু উত্তর প্রদেশে ঠাকুর বলে ক্ষত্রিয়দের। যারা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে কাটাকাটি করে। সেদিনকার অস্ত্রোপচারের সঙ্গে শল্যবিদ্যার কোন সংস্রব ছিল না তবে বিহারের ঠাকুর আর উত্তর প্রদেশের ঠাকুরদের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক ছিল।

তাইতে কিনা বলা মুশকিল তবে রুগীর এবড়ো খেবড়ো মাথা মেরামত হল না। ঘা যখন সেরে গেল দেখা গেল আগেও যেমন ছিল পরেও মাথা তেমনই এবড়ো খেবড়ো রয়ে গেছে। সতু বদ্যির পকেটে গোটা পঁচিশেক টাকা আসা ছাড়া কারো কোন লাভ হয়নি।

রুগী শ্যাম সামন্তের কথা প্রায় সতু বদ্যি ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু মনে পড়লো বড় অদ্ভুত ভাবে প্রায় বছর দুয়েক পরে। সেদিন কিসের যেন ছুটি ছিল। দুপুর বেলা গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা শেষ করে সতু বদ্যি সবে চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়েছে এমন সময় তাকে ডকাতে এল মাইল খানিক দূরের এক বস্তি

থেকে। খুব জরুরী রুগী—এখনই যেতে হবে। চা না খেয়েই যেতে হবে। পেন্টুলুন না পরেই যেতে হবে। রুগীর অবস্থা এখন তখন। কি রকম যেন বারে বারে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে রুগী।

সুতরাং সতু বস্তিকে উঠতে হয়। রিক্সায় চড়ে ব্যাগ হাতে করে এক মাইল দূরে বস্তি বাড়িতে পৌঁছতে হয়।

বেশ বড় বস্তি বাড়িটা। মাঝখানে একটা উঠোন—তার চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট খুপরী ঘর। ঘর আর উঠোনের মাঝখানে ফালি মত বারান্দা। সতু বস্তি গিয়ে উঠোনে ঢোকে। উঠোনে এক অপূর্ব দৃশ্য। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের একটি জোয়ান ছেলে আধ ময়লা একটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে টলতে টলতে বারান্দাটার পাশ দিয়ে উঠোনে ঘুরছে। ছোকরাকে দেখে বাঙালী বলেই মনে হল। ছোকরার পিছনে কিছু হিন্দুস্থানী—তারা হাতে লম্বা লম্বা কড়ুয়া তেলে ভেজানো মোষের চামড়ার নাগরা জুতো নিয়ে চলেছে। ছোকরা বারান্দায় বসতে চেষ্টা করলেই হিন্দুস্থানীরা নাগরা জুতো দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে পেটাচ্ছে। কতগুলো বাঙালী ছেলে এক বালতি জল নিয়ে উঠোনের মাঝখানে বসে আছে। মাঝে মাঝে দু-গ্লাস জল নিয়ে একটি ছেলে ছোকরাকে গিয়ে বলছে, চট-পট খেয়ে ফেল। খেয়ে বমি করো। ছোকরা হয়তো চিঁ চিঁ করে বলে, আর পারি না ভাই। বাঙালী ছোকরারা অমনি গর্জন করে ওঠে পারিস না মানে? পারতেই হবে। হয় জল খাবি না হয় গু খাবি। আর হিন্দুস্থানীদের নাগরাই জুতো ধুম ধুম্ করে পিঠে পড়ে বাঙালীদের হুংকারের প্রতিধ্বনি করে।

অপূর্ব দৃশ্য। সতু বস্তি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। তাকে এ কাজে সাহায্য করে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যে ছোকরা সে। ব্যাপারটা এই—

ছুটির দিন সবাই দুপুর বেলা যে যার ঘরে ঘুমুচ্ছিল। রুগী অর্থাৎ শ্যাম সামন্তও তার নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিল। শ্যাম সামন্তের ঘরে আর একটি ছেলে থাকে সে একদিনের ছুটিতে দেশে গেছে। হঠাৎ শ্যাম চিৎকার করে বাইরে এসে সবাইকে হাঁক ডাক শুরু করলো, 'কে কোথায় আছ শিগ্গীর এস। আমি আফিম খেয়েছি, মরে যাব।' সবাই বাড়িতে ছিল কেউই কারখানায় যায়নি। তাইতে সবাই যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কেউ ডাক্তারের বাড়ি ছুটেছে, কেই ছুটেছে শ্যামের বাড়িতে

টেলিগ্রাম করতে আর বাকীরা দু-দলে ভাগ হয়ে গেছে বাঙালী আর হিন্দুস্থানীতে। হিন্দুস্থানীরা জানে আফিম খাওয়া রুগী একবার ঘুমুলে আর জাগবে না। তাইতে নাগরা জুতা পিটিয়ে তাকে হাঁটাচ্ছে আর বাঙালীরা তাকে বালতি বালতি নুন গোলা জল খাইয়ে বমি করাচ্ছে পেট থেকে যাতে আফিম উঠে বেরিয়ে যায়।

এতক্ষণে সতু বদ্যি ব্যাপারটা বুঝতে পারে। এরা তো রুগীকে বমি করিয়ে আর নাগরা জুতো পিটিয়েই মেরে ফেলবে। এখন প্রধান কাজ হল এদের চিকিৎসার হাত থেকে লোকটিকে বাঁচানো। সতু বদ্যি রুগীর কাছে এগোয়। ইঙ্গিতে বাঙালী হিন্দুস্থানী সবাই থেমে যায়। তারপর সে রুগীকে পরীক্ষা করে। চোখের মণি দেখে, তারা দেখে, হাতের নখ দেখে, পায়ের নখ দেখে, নাড়ীর গতি পরীক্ষা করে, নিশ্বাসের গন্ধ পরীক্ষা করে। তারপর বুঝতে পারে আফিমের বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণ ওর দেহে নেই। সুতরাং একটি ডিষ্টিল ওয়াটার ইনজেকশান দেয়। রুগীর শুভাকাঙ্ক্ষী-দের বলে এই ইনজেকশানেই সেরে যাবে। রুগীকে এখন শুতে দেয়া যেতে পারে। ভয়ের কিছু নেই। বাঙালী হিন্দুস্থানী সবাই আশ্বস্ত হয়ে দূরে দূরে সরে যায়। তারপরে সতু বদ্যি প্রশ্ন করে 'কী খেয়েছিলে?'

'আফিম।' অবাধ্য ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে শ্যাম সামন্ত বলে।

'কেন? আফিম খেতে গেলে কেন?' সতু বদ্যি আবার প্রশ্ন করে।

'আত্মহত্যা করেছি।' আরও দৃপ্ত ভঙ্গিতে শ্যাম সামন্ত উত্তর দেয়।

'কতটা আফিম কিনে ছিলে?

'এতটা' হাত দিয়ে শ্যাম সামন্ত এক খাবলা দেখায়।

'সবটাই খেয়েছিলে?' সতু বদ্যির প্রশ্ন।

না, সবটা শ্যাম সামন্ত খায়নি। বাকীটা ওর ঘরে বালিশের তলায় রয়েছে। ঘরের ভিতরে গিয়ে বালিশের তলা থেকে সতু বদ্যি দুটো জিনিস আবিষ্কার করে। প্রথম হল একটা কাগজের মোড়কে বেশ খানিকটা আফিম আর একটা খামে একটা চিঠি। খামের ওপরে নাম লেখা—সিড়িমতি যুতিবালা সামনত।

'সব আফিমই রয়েছে দেখছি। কতটা খেয়েছ?' সতু বদ্যি বাইরে এসে প্রশ্ন করে।

তর্জনীর প্রান্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটা মুদ্রা করে শ্যাম সামন্ত বলে, 'সামান্য

একটু।'

'বাকীটা রেখে দিলে যে'—এই রকম একটা ব্যঙ্গাত্মক নাটকের নায়ক হতে হওয়াতে সতু বক্সি বিরক্তই হয়।

'বড্ড তেতো।' অবাধ্য ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে শ্যাম সামন্ত উত্তর দেয়। বাঙালী হিন্দুস্থানীদের হাসিকে গ্রাহ্যও করে না। উগ্র ক্ষত্রিয় তো। উগ্র ক্ষত্রিয়কে প্রশ্ন করে জানা যায় সিড়িমতি যুতিবালা শ্যাম সামন্তের স্ত্রী। সতু বক্সি চিঠিটা খুলে পড়তে চেষ্টা করে। 'পরানেশরি' দিয়ে পাঠ আরম্ভ আর 'ছিচরণের দাস শ্যাম সামন্ত' দিয়ে পাঠ শেষ। প্রায় ছয় পৃষ্ঠা চিঠি। হৃদয়ের সমস্ত ভাব সমস্ত বেদনা নিংড়ে দিয়ে যেন চিঠিটা লেখা। বক্তব্য হল সে যুথীবালা সামন্ত শ্যাম সামন্তকে গত দু-বছরে প্রায়ই জিজ্ঞেস করেছে তার বাঁ কানের ওপর ঘাটা কী করে হল। নেহাতই ছেলে বেলায় হয়েছিল আর তা মনে নেই বলে শ্যাম সামন্ত তার সদুত্তর দিতে পারেনি। তাইতে গত দু-বছর যাবৎ কারণে অকারণে যুথীবালা সামন্ত শ্যাম সামন্তকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। শ্যাম সামন্ত তাতে কিছু মনে করেনি। কিন্তু গতবার যখন শ্যাম সামন্ত দেশে গিয়েছিল তখন যুথীবালা বলেছে 'এ মা তোমার ওখানে কি হয়েছিল গো? শেয়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল? ব্যাটাছেলেকে কি শেয়ালে টেনে নিয়ে যায়? তুমি কেমনতর ব্যাটাছেলে গো!' শ্যাম সামন্ত জাতে আগুরী অর্থাৎ কিনা উগ্র ক্ষত্রিয়। তার পৌরুষের এই অপমান সহ্য করা কোন উগ্র ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং শ্যাম সামন্ত আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সাঙ্কোপাঞ্জার গল্প শেষ হয়। খোকার তরুণী মায়ের মুখের ফ্যাকাশে ভাব মিলিয়ে গিয়ে শ্যামবর্ণ মুখে হাসি ফুটে ওঠে। খোকার কাকার মুখেও রাগ মিলিয়ে গিয়ে হাসি ফুঠে ওঠে। খোকারও ঠোঁটের রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে।

সাঙ্কোপাঞ্জার কিন্তু কথা শেষ হয়নি এখনও। সে বলেই চলে।

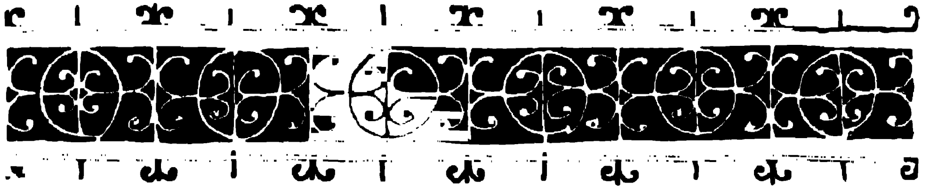
আগে আগে সতু বক্সি নাকি স্বল্পবিত্ত লোকদের জীবন রক্ষাকেই একমাত্র সমস্যা বলে মনে করত। কিন্তু এখন সতু বক্সি জীবনরক্ষা আর দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষা দুইই অপরিহার্য বলে মনে করে। সুতরাং সতু বক্সি কাজও করে নিখুঁত আর তাতে পয়সাও খরচা হয় বেশী। কোন যুথীবালা সামন্তের বৈধব্যের দায়িত্ব নাকি সতু বক্সি নিতে রাজি নয়। সে কারণে

দৈহিক সৌন্দর্যরক্ষায় গত তিন বছর থেকে সতু বদ্যির এত বেশী যত্ন দেখা যায়।

'নিন আপনার ছেলের রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' সাঙ্কোপাঞ্জা খোকার ঠোঁট ছেড়ে দেয়। 'এখন আপনারা ওকে যেখানে খুশি নিয়ে যান আমাদের কোন আপত্তি নেই।' রক্ত মাখা হাতে সাঙ্কোপাঞ্জা উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে সতু বদ্যিও এই সময়ে ঘরে ঢোকে। বলে, 'সাঙ্কোপাঞ্জা, সেলাই রেডি হয়েছে ?'

'ওঁরা আমাদের কাছে সেলাই করাবেন না, অন্য ডাক্তারের কাছে যাবেন।' সাঙ্কোপাঞ্জা উত্তর দেয়।

'না ডাক্তারবাবু' শ্যামলা রঙের তরুণী মা উত্তর করে 'আপনিই করে দিন।' মিছিল করে সতু বদ্যির রুগী দেখার ঘরে ঢোকে রক্তমাখা দামাল ছেলে কোলে উনিশ বছরের শ্যামলা রঙের তরুণী মা—পিছনে পিছনে লক্ষণের মত দেবর, তার পিছনে এলুমিনিয়ামের বাটি হাতে সাঙ্কোপাঞ্জা আর তার পিছনে সতু বদ্যি।



ঘর ও ঘরণী

চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, কাঁচায় পাকায় মেশানো দু-দিনের না-কামানো দাড়ি। সাদা কালো দাড়ির অঙ্কুর উঁকি দিচ্ছে। লংক্লথের পাঞ্জাবী আর মিলের ধুতি পরনে। ভদ্রলোক যখন ঘরে ঢুকলেন তখন রাত প্রায় নটা। সতু বদ্যির ডাক্তারখানায় রুগীর ভিড় পরিষ্কার হয়ে গেছে। সাঙ্গোপাঙ্গা হিসেব মেলাচ্ছে সারাদিনের কাজের আর পয়সার। সতু বদ্যি হাত ধুচ্ছে বাড়ি যাবে বলে।

বিনয়ী হাসি হেসে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, 'আর কোন রুগী আছে কি?'

'না, আর কোন রুগী নেই।' সতু বদ্যি ভরসা দেয় 'আপনার কি জরুরী কিছু!'

না তেমন জরুরী কিছু ভদ্রলোকের নেই। সত্যি কথা বলতে কি চিকিৎসা ঘটিত কোন ব্যাপারেই ভদ্রলোক আসেননি। ভদ্রলোক এসেছেন নেহাতই পরামর্শ করতে। সেও ডাক্তারী পরামর্শ নয়। পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে পরামর্শ করতে এসেছেন। আগেকার গ্রামে যে রকম সব গাঁও-বুড়ো থাকতো। সতু বদ্যি অনেকটা সে রকম পাড়ার গাঁও-বুড়ো কি না। সে জন্যে নেহাতই পরামর্শ করতে এসেছেন।

সুতরাং সতু বদ্যি আর ভদ্রলোক পরামর্শে বসেন। নেহাতই পারিবারিক পরামর্শ। ভদ্রলোক যথেষ্ট উদ্বিগ্ন আর চিন্তিত। ভদ্রলোকের ছেলেটিকে সতু বদ্যি জানে। মা মরার পরে ঐ তো বড় ছেলে। ভাইবোনদের অসুখ বিসুখ করলে সুশীলই নিয়ে আসে ভাইবোনদের। ছেলেটি এমনিতেও ভালো, বি, এ পাশ করার পরে কাজকর্ম করছে। ভাইবোনদের দেখা শোনাও করে। তেমন বড় কাজকর্ম কিছু না করলেও খুব অভাব তো নেই সংসারে। বাড়ি আছে শহরে। বাড়ির ভাড়া পায়, থাকবার ভাড়া লাগে না। কিন্তু ভদ্রলোকের অসুবিধা হল বাড়িতে দেখা শোনার লোকের অভাব। ছেলেপিলে ভদ্রলোকের পাঁচ-ছটি। স্ত্রী মারা গিয়েছেন অনেক দিন।

সংসার কে দেখে ? তাইতে ভদ্রলোক প্রস্তাব করেছিলেন সুশীলের বিয়ের। তার উত্তরে সুশীল যা বলেছে তা শুনে অবধি গত দু-রাত্তির ভদ্রলোক ঘুমোননি। কি যে করবেন কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছেন না।

আচ্ছা, প্রেমা বলে একটি মেয়ে আছে পাড়ায়—সতু বদ্যি হয়তো তাকে চেনে। ভদ্রলোক ঠিক বলতে পারেন না অবিশ্যি কি জাত তারা, তবে বাঙালী নয়। বাংলা যদিও বেশ ভালো বলতে পারে কিন্তু শুনে বোঝা যায় যে বাঙালী নয়। মারাঠী গুজরাটী, হিন্দুস্থানী কিছু একটা হবে। সুশীল বলেছে, সে প্রেমাকেই নাকি বিয়ে করবে। প্রেমা জাতেও বামুন নয়, বাঙালীও নয় তা সত্ত্বেও প্রেমাকেই ও বিয়ে করবে। যদি তার বাবা আপত্তি করেন তা হলে সুশীলের ছোট ভাই সুনীল মানুষ না হওয়া পর্যন্ত ও বিয়ে না করেই থাকবে। সুনীল মানুষ হলে ও প্রেমাকে বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। মা মরা প্রথম ছেলে—কত সাধ করে তার বিয়ে দিতে চেয়েছেন ভদ্রলোক। সে যদি বিয়ে করে তাতে আপত্তি করার কী আছে। কিন্তু ভদ্রলোকের মনে প্রশ্ন আছে, যে-মেয়ে বিয়ের আগে কুমারী অবস্থায় অন্য ছেলের মন ভোলাতে পারে সে কি ভবিষ্যতে অচলা ঘরের লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। আর আমাদের বাঙালীদের ভাষা আলাদা, রুচি আলাদা, ঐতিহ্য আলাদা, আমাদের সঙ্গে কি অন্য জাতের মিল হবে ? তা ছাড়া বর্ণাশ্রম ধর্ম আমাদের ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। ব্যাস বাল্মীকি থেকে গান্ধী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবারই জন্ম এই বর্ণাশ্রমের ভিতরে। আজকের কাঁচা বয়সের ক্ষণিক মোহে সেই বর্ণাশ্রম ভেঙে দেয়া কি যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে।

কঠিন প্রশ্ন সতু বদ্যির সামনে। বয়স কম হলেও সতু বদ্যি বহুদর্শী অনেক দেখেছে, অনেক লোকের সঙ্গে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক। তাছাড়া সুশীলই হোক আর সুনীলই হোক দশ-বারো বছর ধরে তো সতু বদ্যি তাদের চিকিৎসা করছে। সুতরাং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আর সুশীল সুনীলও সতু বদ্যিকে মানে। সতু বদ্যি কি এ সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে পারবে না ? আর যদি দেয় সেটা কি সুশীল সুনীলকে বোঝাতে পারবে না ?

গাঁও-বুড়ো সতু বদ্যিকে ভাবতে হয়। কিন্তু ভেবে আর কি করবে। এসব হল ভবিষ্যতের কথা। বলে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। সুতরাং কার বিয়ে কি রকম উৎরাবে সে সম্বন্ধে সতু বদ্যির কি কিছু বলার

ক্ষমতা আছে ?

তবুও তাকে বলতেই হয়।

আমাদের দেশে হিন্দুধর্মে বিয়ের বিধান আছে আট রকম, ব্রাহ্ম বিবাহ, আর্য বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ, ইত্যাদি। এর ভিতরে নাকি ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ। তবুও তো অহল্যাকে পাষাণ হতে হয়েছিল। ঋষি গৌতম নিশ্চয়ই বিবাহের সময় কোন শাস্ত্রীয় ভুল করেননি। বিশেষ করে তিনি যখন খোদ দেবরাজ ইন্দ্রের গুরুদেব ছিলেন। আবার আমাদের দেশে মা, ঠাকুরমাদের ভিতরে কত লোককে দেখেছি নেহাতই আদ্যিকালের বিয়ে কিন্তু পরস্পরে কত অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসা। তবে ঘটনাচক্রে একটি মেয়ের বিয়ের ঘটনা সতু বক্সির মনে আছে আর মনে পড়ছে। সেই মেয়েটির গল্পের শেষ অধ্যায় দেখার পরে সতু বক্সির আর ভরসা হয় না কারো বিয়ের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে।

মেয়েটীর সঙ্গে সতু বক্সির প্রথম দেখা হয় ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের শুরুতে। তখন সবে গ্রাম থেকে চাষী, ক্ষেত মজুরের দল আসা শুরু করেছে। সতু বক্সি তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। সরকার থেকে বন্দোবস্ত হয়েছে সাড়ে ছয় আনা করে সের চাল দেবে মাথা পিছু। কিন্তু দোকানে গিয়ে লাইন লাগাতে হবে আর রোজই একসের করে চাল পাওযা যাবে। কিন্তু লাইন হয় বিরাট লম্বা। অনেক ছাত্ররা সেই লাইনে যাতে কোন গুণ্ডামী বা গোলমাল না হয় এ সব দেখা শোনার জন্যে পাহারা দিত। তাদের ভিতরে সতু বক্সিও একজন ছিল। গোলমাল প্রায় রোজই হত। কোনদিন সামান্য কোনদিন বেশী। আর সেই ঝগড়াঝাঁটি গোলমালের মিটমাট করতে হত ছাত্রদের। লাইনে কেউ হয়তো একজনকে ঠেলে আগে চলে গেছে, কেউ হয়তো টিকিট পেয়েছে চাল পায়নি এসব নানা রকম গোলমাল। কখনও ঝগড়া হত, কখনও মারামারি হত আর মেয়েদের ভিতরে হলে চুলোচুলি হত।

এই রকম একটি ঘটনাতে মেয়েটির সঙ্গে সতু বক্সির প্রথম দেখা হয়। ছোট একটা গলির মোড়ে একটা মেয়ে পড়ে আছে—মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে গলগল করে। পাশে রোগা মত লোক—নেহাতই গেঁয়ো ভূত—চেঁচাচ্ছে। মেয়েটির পাশে একঠোঙ্গা চাল ছড়িয়ে পড়ে আছে। পরনে একটা ছেড়া নোংরা শাড়ীর টুকরো। ফ্যাকাশে কালো গায়ের রঙ হলেও ছেঁড়া শাড়ীর ভিতর দিয়ে দুরন্ত যৌবন উঁকি দিচ্ছে। আর চারপাশে ভিড় করছে নানারকম লোক। রক্তের গন্ধে যে রকম মাছি আসে, ফোটা চালের গন্ধে দুর্ভিক্ষের দিনে সে রকম মানুষ

আসে, দুরন্ত যৌবনের গন্ধে যে রকম যুবকরা আসে।

মেয়েটিকে রিক্সায় চাপিয়ে সতু বক্সিদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল সেলাই করতে। রিক্সার ওপরে মেয়েটি, তার স্বামী আর তাদের কোলে দুটো রুগ্ন উপোসী বাচ্চা। গোটা একটা সংসার। আর রিক্সার পাশে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল সতু বক্সি। ভলান্টিয়ার কিনা। যেতে যেতে শুনলো কি করে ঘটনাটা ঘটেছে। কিছু দিন হল বাজারে দুটো লাইন হচ্ছিল। একটা ছেলেদের একটা মেয়েদের। বউটির স্বামীর কয়েকদিন ধরে বেশী দাস্ত হচ্ছিল। ভোর রাত্তিরে দুজনে দুটো লাইনে গেছে চাল আনতে। বউটি আগে চাল পেয়ে গেছে। অন্যান্য দিন দু-সের চাল পেলে একসের ওরা বেচতো ঠিক ডবল দামে—তের আনা করে। আর ভিক্ষে-সিক্ষে করে যদি কিছু খাবার টাবার পাওয়া যেত কিংবা যদি লঙ্গরখানার খিচুড়ি পাওয়া যেত তাহলে হয়তো বাকী চালটাও বিক্রি করে দিত। আর তা নইলে একসের চাল সেদ্ধ করে চার-জনে খেতো। সেদিন বউটি আগে চাল পেয়ে গেছে। এসে দেখে লাইনে বসে স্বামী ধুঁকছে। তাইতে বউটি স্বামীকে বললো, সরো আমি তোমার জায়গায় বসি। ব্যাস তাই নিয়ে গোলমাল। এদেক একজনের জায়গায় আরেকজনের বসা, তার ওপরে যে বসছে তার হাতে নগদ এক পুঁটলি চাল। আশে পাশের ক্ষুধার্ত লোকরা জ্বলে ওঠে। কথা কাটাকাটি হয়েছিল কিন্তু কি কথা হয়েছিল তা ওদের মনে নেই। কেবল মনে আছে একটি বিরাট যোয়ান লোক বউটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল আর গল গল করে বউটির মাথা দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো।

মেয়েটির মাথাটা কেটেছে বড় অদ্ভুত ভাবে। মেয়েটি সিঁথিতে যেখানে সিঁদুর দেয় তার পাশ দিয়ে সমান্তরালভাবে। তা লম্বায় প্রায় ইঞ্চি দুই হবে, গভীরও মন্দ নয়। সতু বক্সি নিজের হাতেই সেলাই করে। তখন সবে ফোর্থ ইয়ারে উঠেছে, এই সব ছোট-খাটো ডাক্তারী করতে বেশ লাগতো আর তাইতে বোধ হয় ছাত্র সতু বক্সি সেদিন ওদের চারজনেরই খাবার বন্দোবস্ত নিজেদের মেসে করে দিয়েছিল।

ওরা বোধ হয় সতু বক্সির মেসটা চিনে রেখেছিল।

সেলাইটা কাটার পরে আরও একদিন দেখা হয়েছিল সতু বক্সির সঙ্গে ঐ বউটির। তখনকার দিনে নেহাতই একটা মামুলী ঘটনা। সবাই দেখেছে—এই রকম অনেক ঘটনা দেখেছে। বউটির কেন যেন ধারণা হয়েছিল সতু বক্সি

বউটিকে সাহায্য করতে পারে। রাত দুপুরে মেসের সামনে দাঁড়িয়ে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে সতু বক্সিকে তুলে নিয়ে গেল। তার স্বামীর নাকি অবস্থা খারাপ। সতু বক্সি গিয়ে তখনকার দিনের অতি সাধারণ একটা ঘটনা দেখলো। মল-মূত্রে নোংরা হয়ে মানুষটা মরে পড়ে আছে। তার পাশে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে দুটি শিশু।

আর ফিরে আসবার সময় বিলাপ শুনলো বউটির—করুণ বিলাপ। স্বামীর জন্যে বিলাপ, বাপের বাড়ির জন্যে বিলাপ, শ্বশুর বাড়ির জন্যে বিলাপ, ইনিয়ে বিনিয়ে মড়া কান্না। নিজের দেহ বিক্রি করে স্বামী পুত্রদের খাওয়াবে ভেবেছিল। তা তো আর পারলো না। স্বামী তো মারাই গেল। সেই দেহ বিক্রির পাপেই হয়তো গেল। সেই জন্যে বিলাপ। সে রাত্রে ফিরে আসবার সময় খুব বেশী কিছু চিন্তা সতু বক্সি করতে পারেনি। সেদিনের কুৎসিত বীভৎসার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তার ক্ষমতা সবারই লোপ পেয়েছিল। সতু বক্সিরও ছিল না।

কিন্তু এখন পিছন দিকে তাকিয়ে সেই দৃঢ়বদ্ধ পরিবার—নেহাতই ক্ষেতমজুরের পরিবার—আর তাদের বিয়োগান্ত কারুণ্য সব মনে পড়ে।

মনে পড়তো না ভুলেই গিয়েছিল সতু বক্সি কিন্তু অদ্ভুত ভাবে তাদের মনে পড়েছে বারো বছর বাদে—প্রায় পরের যুগে। শহর ছড়িয়ে যে বস্তিগুলো আছে যেখানে সতু বক্সি ধন্বন্তরী সেখান থেকে উড়ে মিস্ত্রি এল তার পেটে ব্যথা ওয়ালা বউএর চিকিৎসা করাতে। ঘোমটায় মোড়া পুঁটলি মত একটা বউ ছোট একটা বাচ্চার হাত ধরে বুড়ো উড়ে মিস্ত্রির সঙ্গে সতু বক্সির চেম্বারে ঢুকলো।

কী হয়েছে?

বউটির পেটে বড় ব্যথা করে। গোটা তলপেটেই বড় ব্যথা করে। আধা বাংলা আধা উড়িয়া মিশিযে বুড়ো উড়ে মিস্ত্রি সতু বক্সিকে বোঝায়। তার তো সংসার বলতে এই বউ আর এই বাচ্চা। বউটিকে যদি ডাক্তারবাবু সারিয়ে না দেন তা হলে বুড়োর সংসার অচল।

বুড়োর কথার মাঝখানে হঠাৎ বুড়োর বউ প্রতিবাদ করে—না, তার চিকিৎসার কোন দরকার নেই। বুড়োরও পেটে ব্যথা বুড়ো চিকিৎসা করায় না সুতরাং বুড়োর বউও চিকিৎসা করাবে না। বুড়ো যদি ওষুধ নেয় তবে বুড়োর বউও নিতে পারে। এখন পয়সা আছে একজনের চিকিৎসা করার

মত। সুতরাং দুজনের ঝগড়া বেশ বেধে ওঠে। একজনের মত পয়সা হলে কে সেটাকে ব্যবহার করবে? এই হল ঝগড়ার বিষয়বস্তু। সতু বদ্যি খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মিষ্টি ঝগড়া শোনে। ঝগড়াটা আরও মিষ্টি লাগছিল দুজনের ভাষায়। মিস্ত্রির কথায় উড়ে টান—চেষ্টা করছে বাংলা বলতে আর তার বউয়ের কথায় বাংলা টান—চেষ্টা করছে উড়িয়া বলতে। ঝগড়া বেশ পাকিয়ে ওঠে। তার মাঝে সতু বদ্যি আর বুড়োর মেয়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত মীমাংসা করে সতু বদ্যি। চিকিৎসা দুজনেরই হোক। যে টাকাটা কম পড়বে সে টাকাটা বুড়ো যেন পরের মাসে কিংবা তার পরের মাসে আস্তে আস্তে শোধ করে দেয়। সুতরাং বউটি টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে পরীক্ষা করাবে বলে। পরীক্ষা করা কি সোজা কথা। টেবিলে যদি গুলো শাড়ী জড়িয়ে টোপলাটি হয়ে রইল। অনেক কষ্টে সতু বদ্যি নাড়ী দেখে, পেট দেখে, যকৃৎ দেহে, প্লীহা দেখে, তারপরে চোখের কোল দেখে—রক্তশূন্যতা কিংবা ন্যাবা কিছু নেই তো? তখন সতু বদ্যির চোখে পড়ে। সিঁথির পাশ দিয়ে প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা একটা কাটা দাগ। বেশ বোঝা যায় জায়গাটা সেলাই করা হয়েছিল। সতু বদ্যির জীবনে প্রথম সেলাই করা ভুল হয় না।

তখন সতু বদ্যি প্রশ্ন করে। মেয়েটা উত্তর দিতে কসুর করে না। বারো বছর আগে যার মাথা সতু বদ্যি সেলাই করেছিল এই সেই বউ। বারো বছর আগে যার স্বামীর সৎকারের ব্যবস্থা সতু বদ্যি করেছিল এই সেই বউ। স্বামী সৎকারের পরে আরও একটি সৎকার করতে হয়েছিল বউ-টিকে তবে সে সময়ে আর সতু বদ্যির সাহায্য পায়নি। সে হল বউটির ছেলের সৎকার। তারপরে গড়াতে গড়াতে কয়েক মাস ভুগতে হয়েছে বউটির—অনেক মন্দ কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু স্বামীর আশীর্বাদ ছিল তাইতে শেষ পর্যন্ত এই উড়ে মিনসে জুটলো। প্রথমে এমনিতেই ছিল উড়ের কাছে তবে পড়ে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে। বুড়ো বড় যত্ন করে তার বউকে। করবে না প্রথম স্বামীও কম যত্ন তো করেনি বউটির। সেই স্বামীর আশীর্বাদ সঙ্গে সঙ্গেই আছে আর সেই আশীর্বাদেই এই বুড়ো জুটেছে। জোড় হাত করে বউটি কপালে ঠেকায়। সিঁথির রেখা আর কাটা রেখা কপালের ওপরে চকচক করে।

আর সেই মেয়েটি—আগের স্বামীর মেয়ে—আকাল চলে গেলে দেশের আত্মীয় স্বজনকে ধরে পাঁচ বছর বাদে বিয়ে দিয়েছিল তারা। উড়ে মিস্ত্রি তখন অনেক টাকা দেয়।

গল্প করতে করতে মেয়েটি উঠে বসে উড়ে মিস্ত্রির মেয়েকে কোলে করে, পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে নমস্কার জানায়। উড়ে মিস্ত্রিও ফোড়ন কাটে, বড় দুঃখী নামি বউটা।

সতু বস্থি যত তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে ততই যেন নতুন করে দেখতে পায় ওদের।

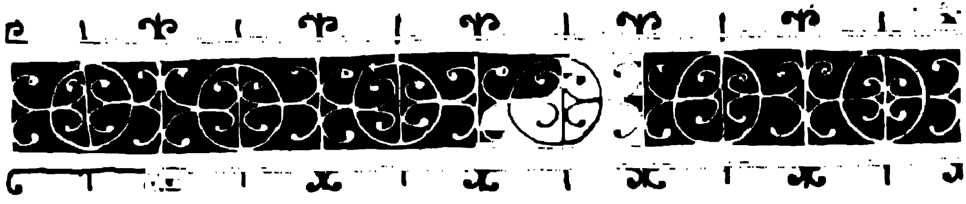
উড়ে মিস্ত্রি তো চলে গেছে তার পরের বউও চলে গেছে। সেও আজ অনেক দিন—কয়েক মাস হবে। কিন্তু সতু বস্থি তারপর থেকে আরও গুলিয়ে ফেলেছে সব। সেই জন্যেই বৈবাহিক সুখের মূল তত্ত্বটি বলতে পারে না। নিজেই জানে না অপরকে কি বলবে ?

বালিগঞ্জ পাড়ায় বসে সতু বস্থি যদি বলে সাধারণ মোটা রকম ভালবাসা ছাড়া বিয়ের অন্য কোন রকম অপরিবর্তনীয় আইন নেই তা হলে কি লোকে তাকে মানবে ?

সেই জন্যেই সতু বস্থি ভদ্রলোককে ভালো-মন্দ কিছুই বলতে পারবে না। সুশীলের বিয়ে করা উচিত কি উচিত না, সুখী হবে কি হবে না সে কথা বলা সতু বস্থির পক্ষে সম্ভব নয়। দুজনে উদাস ভাবে রাস্তায় তাকায়।

আরে—দূরে সুশীল আর প্রেমা ফিরছে না ? সাড়ে নটা হল—বায়স্কোপ দেখে ফিরছে না কি ? ভদ্রলোকও দেখতে পান। দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন—'এ বিয়ে আমি হতে দেব না। যে করেই হোক ওদের বিয়ে আমি ভেঙে দেবোই এ কী অন্যায় !'

সতু বস্থির আরও দার্শনিক স্বর বেরোয় গলা দিয়ে, 'ভেঙে যদি দেন ভালো হবে কি মন্দ হবে তা আমি জানি না। তবে ভাঙতে পারবেন কি ?'



অস্পষ্ট

গল্প শুনে কর্তাবাবু চটে কাঁই। একি একটা ভূতের গল্প হল। এ যেন বেতালপঞ্চবিংশতি। গল্প শেষ হতেই বেতাল এক প্রশ্ন করে বসল। তার মানে সতু বক্সি আসলে ভূতের গল্পও জানে না আর ভূত বিশ্বাসও করে না, তা নইলে এ রকম ভূতের গল্পের আসরটা আজেবাজে গল্প করে মাটি করে দেয় কেউ!

কিন্তু সতু বক্সির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্যিই অন্যায়। গল্প সতু বক্সি জানে। ভূত, পেত্নি, মামদো, বেহ্মদত্যি, জিন, পরী, হুরী অনেক গল্প জানে। আর বিশ্বাস- অবিশ্বাসের প্রশ্নই যদি হয় কে যে কিসে বিশ্বাস করে তা কি আর হলফ করে বলা যায়। নাম হয়তো রাম বিশ্বাস পুজো করে মা-কালীর এ তো হামেশাই হচ্ছে। তবে বর্ষার সন্ধ্যে—চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, গলির রাস্তার আলোগুলো ফিউজ হয়ে গিয়েছে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। সামনে টেবিলে গরম মুড়ি, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা—এই রকম লোভনীয় পরিবেশে যদি আবার কর্তাবাবুর মত শ্রোতা, শাস্ত্রী মশাইএর মত বক্তা, বড়দার মত আড্ডাধারী (আড্ডাকে যিনি ধারণ করে থাকেন) থাকেন তা হলে সে সন্ধ্যার আড্ডায় বসতে সতু বক্সিরও লোভ হয়। তাইতে সতু সক্সি বসেছিল। সবাই বল্‌লে সতু বক্সি মড়া-আধমরা নিয়ে কারবার করে সতু বক্সি কি কখনও ভূত দেখেছে? সে কি ভূতের গল্প দু-একটা জানে? বলতে পারে? তাইতে সতু বক্সি গল্পটা বলেছিল।

গল্পটা হল মোটামুটি এই। মেডিকেল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে সবে মড়া কাটা শুরু হয়েছে। দুটি ছেলের ভিতর বাজী হয়েছে। কে কি রকম সাহসী তাই দেখতে হবে। সাহসের পরীক্ষা কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত ঠিক হল এই রকম বাদলার দিনে রাত দুপুরে মড়া-কাটার ঘরে ঢুকতে হবে। আগের দিন চাবি সংগ্রহ করে রাখতে হবে তারপর অন্ধকারে একটি মাত্র মোমবাতি

সম্বল করে অ্যানাটমি হলে টেবিলগুলোর ওপরে যে-কটি মড়া আছে সব মড়াগুলোর মুখে একটি করে বাতাসা রেখে আসতে হবে। যদি কেউ পারে তা হলে যে পারবে সে দশ টাকা বাজী জিতবে।

সে-দিনও এই রকম বর্ষা ছিল। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। অন্ধকার রাত। একটি ছেলে পকেটে একটি মোমবাতি নিয়ে রাত দুপুরে চাবি খুলে আস্তে আস্তে গিয়ে অ্যানাটমি হলে ঢুকলো। চারদিক নিঝুম। একটা ইঁদুরের খস্ খস্ শব্দে গা ছম্ ছম্ করে ওঠে। নিজের পায়ের শব্দ নিজের নিশ্বাসের শব্দ সেই নৈঃশব্দ্যে যেন অপরিচিত হয়ে কানে বাজে। ছেলেটি তার ভিতরে মোমবাতি ধরায়। লম্বা লম্বা কালো-কালো শুকনো দুর্গন্ধ অর্ধগলিত শবদেহ টেবিলে সাজানো আছে দেখা যায়। ছেলেটার গা-টা একটু ছম্-ছম্ করে ওঠে। ছেলেটা একটু নড়ে—হলের থামগুলোর ছায়া নড়ে ওঠে। লম্বা টেবিলের ছায়াগুলো আরও লম্বা হয়ে যায়। টেবিলের ওপরে ছায়ার মত সাজানো শবদেহগুলো যেন আচমকা নড়ে ওঠে। ছেলেটা একটি শবের মুখে একটি বাতাসা দেয়। আবার আর একটা টেবিলে যায। আর একটা শব-দেহ—এই রকম শবের পর শব ছেলেটি পার হয়ে যায়। একটি হিন্দুস্থানী শব পার হয়ে ছেলেটি পিছু ফিরেছে পরের শবকে বাতাসা দিতে হবে। হঠাৎ পিছনে একটা খস্ খস্ আওয়াজ হয়। তারপর একটা গোঙানির মত আওয়াজ —ঠিক বোঝা যায় না। ছেলেটা থমকে দাঁড়ায়। দুর্বোধ্য গোঙানিটা ক্রমশ ক্ষীণ হিন্দীতে রূপান্তিত হয়। ভাঙা ভাঙা নাকী সুর, 'খোদা তেরা ভালা করে, আওর এক বাতাসা দে মালিক।' ছেলেটি পেছনে ফিরতে ফিরতে উত্তর দেয় 'আওর বাতাসা নেহি মিলি, এক মুর্দা এক বাতাসা।' পেছনে ফিরে ছেলেটি আবিষ্কার করে যে-ছেলেটি বাজী ধরেছিল সেই ছেলেটি টেবিলের তলায় বসে আছে।

এখন সতু বদ্যির প্রশ্ন যে কার সাহস বেশী ?

তার উত্তর তো কেউ দিলই না, মাঝখান থেকে কর্তাবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন। এটা নাকি একটা ভূতের গল্পই হল না। আসরটা সতু বদ্যি নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় তা ছাড়াও অভিযোগ আছে। সতু বদ্যি নাকি ভূতের খবরও রাখে না, ভূতে বিশ্বাসও করে না।

সতু বদ্যি জোর প্রতিবাদ করে। সে বিশ্বাস করে না ভূতে? হাড়ে হাড়ে বিশ্বাস করে। খবর যে রাখে না তাও ঠিক নয়। অনেক ভূতের

খবর রাখে। বিশ্বাস না হয় সদ্য—একেবারে সদ্য—যামদো আর দেশী ভূতের গল্প বলবে। কর্তাবাবু তো পাত্তাই দেন না। এরকম একটা বেহদ্দ নাস্তিক বেরসিক লোক সে ভূতের কী জানে। আড্ডায় বসার উপযুক্তই সে নয়। সে চলে যাক তার ডাক্তারখানায়, সেখানে গিয়ে রুগী মারুক কি রুগীর পকেট মারুক তাতে কর্তাবাবুর আপত্তি নেই। কিন্তু আড্ডায় কেন বাবা। আড্ডাটা হল ভদ্দরলোকের জায়গা।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি বড়দা উদ্ধার করেন। ফাঁসির আসামীকেও যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেয়া হয় তখন সতু বদ্যি ঘোর নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে আর একবার সুযোগ দেয়া হোক। দেখা যাক সে নাস্তিক হলেও তার রসজ্ঞান আছে কি না।

সুতরাং সতু বদ্যি আরম্ভ করে—

কন্‌কনে শীত। কলকাতা শহরে সচরাচর এ রকম শীত পড়ে না। সন্ধ্যের পরে মনে হয় হাত বের করলে হাতটা জমে যাবে। ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমুলে মনে হয় কে যেন জানলা দিয়ে হিমেল ফুঁ দিচ্ছে। তবে হ্যাঁ, রাত্তির বেলা গরম টার্কির রোস্ট ভালো বিরিয়ানি সহযোগে খেয়ে লেপের তলায়—খুব পুরু লেপের তলায়—ঘুমুতে ভারি মজা। বাইরে হিম পড়বে। রাত ক্রমশ গভীর হয়ে আসবে, আরও গভীর হবে। রিক্সার ঠুং ঠুং গলি থেকে মিলিয়ে যাবে। দূরে ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে। গোটা রাস্তাটা যখন শীতে জমে যাবে আর সেই সময়ে পূর্ণ ভোজে তৃপ্ত হয়ে গরম পুরু লেপের নীচে সতু বদ্যি ঘুমিয়ে থাকবে। বাইরের দুনিয়া হিমে জমে যাক ফসিল হয়ে যাক তাতে কিছু এসে যায় না। এসে শুধু যায় যদি বাইরে থেকে কেউ হাঁক দেয়—'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু।' তখন সেই শীতে উঠতে হয়। ফ্লানেলের শার্ট গায়ে দিতে হয়, গরম ট্রাউজার পরতে হয়। উলের মোজা পায়ে দিতে হয়। বিহাইভ উলের সোয়েটার গায়ে দিতে হয়। গরম টুইলের কোট তার ওপর চাপাতে হয়। পুরু চামড়ার জুতো পায়ে দিতে হয়। তারপরে নীচে নামতে হয়। তেমনি সেদিন ঘুমিয়েছিল সতু বদ্যি। মাঝরাত গড়িয়ে যাবার পরে দরজা খুলে দেখলো একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। এসেছে অনেক দূর থেকে। তাদের বস্তিতে একবার যেতে হবে।

কেন কী হয়েছে?

না লোকটি কারখানায় দুটো-দশটার শিফ্‌টে কাজ করছিল। কারখানাটা বেশ দূরে। রাত দশটার সময়ে কাজ শেষ হয়ে গিয়ে বাড়ি ফিরছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু খোয়ার রাস্তা। মাঝে মাঝে ছোটছোট খোলার ঘর, হয়তো বা টিনের ঘর। মাঝে মাঝে ডোবা। রাত্তির বেলা এক পায়ে দাঁড়িয়ে তাল গাছ আর খেজুর গাছের লম্বা লম্বা পাতাগুলো হাতছানি দেয়। গা-টা ছম্‌ ছম্‌ করে অন্ধকারে। তেমনি অন্ধকারে আসছিল লোকটি—সতু বন্থির রুগী। রাস্তাটা এসে বড় রাস্তায় পড়েছে। সেই মোড়ের মাথায় একটা বড় বট গাছ। আদ্যিকালের বটগাছ তার ডালাপালা তার ঝুরি আর গুঁড়ি সব মিলিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার মোড়ে। সেখান দিয়ে আসছিল যখন লোকটি তখন ভূত দেখেছে ঠিক বটগাছ তলায়। ও একাই দেখেছে।

ও মানে রুগী। রুগীর নাম গোপাল পোলেন। ভয়ানক ভূত, ভীষণ ভূত, ভীষণ ভূত দেখে ভয়ংকর ভয় লাগে। কর্তাবাবু যদি এখন জিজ্ঞেস করেন কি রকম দেখতে তা সতু বন্থি বলতে পারবে না। তার কারণ লোকটি ভয় পাবার পর থেকে আবোল-তাবোল বকছে। খুব ভয় পেয়েছে সুতরাং ভূতটা দেখতে নিশ্চয়ই ভয়ানক। আর তাড়াও করেছে লোকটাকে বেজায় তা নইলে অত হাঁপাবে কেন? আর এখন লোকটি ডাকতে এসেছে তার কারণ গোপাল পোলেন অনবরত মূর্ছা যাচ্ছে। লোকে বলে ভয় পেলে নাকি অনেক সময় খুব কঠিন অসুখ করে। ডাক্তারবাবু কি একবার যাবেন? মেটে রঙের খদ্দরের চাদরের ভিতরে গোপাল পোলেনের দূত নুয়ে পড়ে। বিনয়ে আর শীতে নুয়ে পড়ে।

যেতে হলই সতু বন্থিকে। গলিটার ভিতরে থেমে যাওয়ার রিক্সার আওয়াজ হয়—ঠং ঠুং ঠুং ঠং। সতু বন্থি আর গোপাল পোলেনের দূত বসে থাকে রিক্সায়। রিক্সা পাড়ার রাস্তা ছেড়ে বাসের রাস্তা ধরে। সতু বন্থি ঝিমোয়। বাসের রাস্তা ছেড়ে আবার বেপাড়ার রাস্তা ধরে। সতু বন্থি ঝিমোয়। রাস্তা ছাড়িয়ে রেললাইন পেরিয়ে শহরের এলাকা ছাড়িয়ে গ্রামের এলাকায় রিক্সা ঢোকে।

গ্রামের প্রান্তে গোপাল পোলেনের বাড়ি। শান্তির প্রতিমূর্তি ঘরখানা শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন মাঝরাতে লাউ কুমড়োর গাছে টালি দিয়ে ছাওয়া ঘরটা ভরে থাকে মায়াময় রূপে! যেন—

ফিসফিস করে পাতায় পাতায়
উশখুশ করে হাওয়া
ছায়ার আড়ালে গন্ধরাজের
তন্দ্রাজড়িত চাওয়া।

কিন্তু ঘরের কাছে যেতেই স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। বাড়ির ভেতরে যেন একটা দাঙ্গা হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভারি গলার ভয়ার্ত আওয়াজ ঐ-ঐ-ঐ! আর একসঙ্গে কয়েকজন পুরুষ-মেয়ের চিৎকার ধর-ধর-ধর! সতু বদ্যি ঘরে ঢোকে। একখানাই ঘর। বাড়িতে কিন্তু অনেক লোক। গোপাল পোলেন আছে, তার বউ আছে। নতুন বিয়ে করা বউ। গোপাল পোলেনের মা আছে আর এক জাঠতুতো ভাইও থাকে—যে ডাকতে গিয়েছিল সতু বদ্যিকে। আরও কে কে যেন সব থাকে। এত লোক থাকে কোথায়? কেন? একটা মশারীর নীচে গোপাল পোলেন আর তার বউ থাকে। আর একটা মশারীর নীচে থাকে তার মা আর জাঠতুতো ভাই। এই রকম আর কি। গোপাল পোলেন আবার চিৎকার করে ঐ-ঐ-ঐ। হুঁ, ভূত দেখার সব লক্ষণই বর্তমান। এই শীতের ভিতরে তার মাথায় ডোবা থেকে এক কাঁড়ি পচা পানা চাপানো হয়েছে আর তার ওপরে ঢালা হচ্ছে বালতি বালতি নালা-ডোবার জল। গোপাল পোলেন মাঝে মাঝে চিৎকার করছে ঐ-ঐ-ঐ আর পালাতে চেষ্টা করছে আর সবাই মিলে পাল্টা চিৎকার করছে ধর-ধর-ধর।

কি 'চিকিৎসা করলে ডাক্তার?' নিরপেক্ষ বড়দা প্রশ্ন করেন।

চিকিৎসা সতু বদ্যি ভালই করেছে। ভৌতিক ব্যাপারের লক্ষণ যদিও রোগীর সর্বাঙ্গে লেখা ছিল, ভালো করেই লেখা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সতু বদ্যির ওষুধে কাজ করেছে। সুতরাং সতু বদ্যিকে ওঝা না বলে তো উপায় নেই।

'কি চিকিৎসা করলে ডাক্তার?' প্রশ্ন করেন শাস্ত্রী মশাই। তিনি আবার হোমিওপ্যাথি জানেন কিনা।

সতু বদ্যি দিয়েছিল ঘুমের ওষুধ কয়েক দিনের—সেটা হল ফার্স্ট এইড। আর পাকাপাকি চিকিৎসা হিসাবে করেছিল একটা আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত। গোপাল পোলেন আর তার নতুন বিয়ে হওয়া বউয়ের জন্যে।

'তাতে সেরে গেল'? সমস্বরে চিৎকার করেন বিচারক কর্তা মশাই, হোমিও-প্যাথিক শাস্ত্রী মশাই এবং আড্ডাধারী বড়দা।

তা তো সতু বদ্যি জানে না—তবে গত এক বছরে আর ভূতে ধরেনি তাদের।

আর সেদিন—কয়েকদিন আগে গোপাল পোলেনের একটা খোকা হয়েছে।

'এটা ভূত নিয়ে গল্প হলেও ভূতের গল্প নয় কারণ আমরা গোপাল পোলেনকে দেখলাম, গোপাল পোলেনের মাকে দেখলাম, তার বউ দেখলাম মায় তার ঘর অবধি দেখলাম কিন্তু ভূত তো দেখলাম না।' নিরপেক্ষ বড়দা রায় দেন 'যাই হোক তোমার মামদোটি ছাড়ো তো বাপু।'

না, সতু বক্সি ভূত দেখাবে তো বলেনি তবে ভূতের খবর রাখে বলেছে। এটাও একটা ভূতের খবর। সতু বক্সি আত্মপক্ষ সমর্থন করে।

হ্যাঁ, তারপর মামদোর খবর। যে কারখানাটায় গোপাল পোলেন কাজ করে সেই কারখানাটা সতু বক্সির বাড়ি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। আর যে কারখানাটায় মামদোর খবর সেই কারখানাটা সতু বক্সির বাড়ি থেকে উত্তর পূবে। সেখান থেকে দেখাতে এল কোরিয়া কাহার। সাট বছরের ওপরে বয়স হয়েছে। শনের নুড়ির মত চুলগুলো ধুলো আর তেলে জট পাকিয়ে শ্বেতবর্ণকে কলঙ্কিত করেছে। কপালের বলি আর চোখের মণির চারপাশে গোল সাদা রেখা প্রাচীনত্বের সাক্ষী দেয়। নুব্জদেহে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লোকটা ঘরে ঢোকে। যন্ত্রণাকাতর বিবর্ণ মুখ। এসে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে 'গোড় লাগি সরকার!'

'কী হয়েছে?'

হাঁটুতে ব্যথা। কোমরে ব্যথা, সর্বাঙ্গে ব্যথা। আর হাঁটুটা ফুলে গেছে।

'কী করে হল?'

কারখানার এক কোণে স্তূপাকৃত জিনিস রয়েছে। কি জিনিস তা ও জানে না। কোরিয়া কাহারকে ওপর থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে দিতে হয় নীচে। আগের দিন রাত্রে ছিল নাইট ডিউটি। ওখানে কাজে যেতে ওর ভয় হচ্ছিল। কিছুদিন আগে ওর পাশের মেশিনে একটা মুসলমান মারা গিয়েছিল। মেশিনের ভিতর ঢুকে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে একটা মাংসের ডেলা হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছিল না মানুষ না গোরু, হিন্দু না মুসলমান—সেও রাত্তির বেলা। সেই থেকে সেই মুসলমানটা ওখানে মামদো হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু চাকরি তো করতে হবে। তাইতে দু-পাত্তর তাড়ি খেয়ে গিয়েছিল কাল রাতে কাজে কিন্তু মাঝরাতে বাইরে যখন সব নিঝুম হয়েছে কেবল কারখানার হুস্ হুস্ টং টং ছাড়া যখন আর কোন আওয়াজই হচ্ছে না। যখন শেষবারের মত ঘুম একবার জেঁকে ধরতে চেষ্টা করে ঠিক সেই সময়ে সেই মামদোটা এসেছিল।

এসেই 'ট্যাঙ্গরি পাকড়কে ধাঁ ফেক দিয়া নীচে।' তারপরেই পা ফুলে গেছে। বলিগ্রস্ত বৃদ্ধের সরল চোখে মিথ্যার কোন ছাপ নেই। সতু বদ্যি বিশ্বাস করে তার কথা। তার চোখের মণিতে আর একটু বেশী চকচকে হয়ে যাওয়া চোখের সাদা অংশে সতু বদ্যি সরল সত্যবাদী মানুষ দেখতে পায়। অবিশ্বাসের কি প্রশ্ন সেখানে? তাইতে সতু বদ্যি আবার তারও চিকিৎসা করে।

হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রী মশাইয়ের কৌতূহলের শেষ নেই। 'কি চিকিৎসা করলেন বদ্যি মশাই?'

চিকিৎসা সতু বদ্যি বলে। বুড়োর চোখের সাদা অংশটা একটু বেশী চকচকে সাদা ছিল। তার মানে এই শরীরে ভিটামিনের অভাব আর ভিটামিনের অভাব হওয়া মানে রাতকানা হয়ে যাওয়া। সুতরাং ভিটামিন-এ খাওয়াতে হয়েছিল। আর বৃদ্ধের রাত্রে ডিউটিটা বন্ধ করতে হয়েছিল ইউনিয়নের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে। তাছাড়া অবিশ্যি ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ দিয়ে হাঁটুটা বেঁধেও দিতে হয়েছিল। লোকটা সেরে গেছে। তবে আবার ভূত দেখবে কিনা সতু বদ্যি জানে না। মামদোরা ভারি গোলমেলে। মন্তর-টন্তরও মানে না। ওষুধ-বিষুধও মানে না। তার ওপরে বলিগ্রস্ত বৃদ্ধ রোগী। চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে দেহের হিসাবে জমার চাইতে খরচের অঙ্কটা বেশী হয়ে গিয়েছে তাইতে এই বিপত্তি।

বড়দা খুশি নন। ভূতের খবর রাখলেই তো হবে না ভূত দেখতে হবে। এমন ভূত যা দেখে গা শিউরে উঠবে, গা ছম্‌ছম্ করলেই চলবে না। হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাবে যেন ভীমের বধ করা কীচক। মামদোর নাম করলেই কি আর মামদোর গল্প হল।

অত শত সতু বদ্যি জানে না। ভূতের খবর রাখে সেই প্রমাণ দেবার কথা। সেই প্রমাণ দিয়ে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, হাত-পা পেটের ভিতরে সেঁদিয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার একটাই হয়েছিল সে গল্প সতু বদ্যি বলতে পারে।

প্রথম ফাল্গুনের রাত—তার বিবরণ দেয়া সতু বদ্যির অসাধ্য। ফাল্গুন মানে পঞ্জিকার ফাল্গুন নয় দক্ষিণের হাওয়ার ফাল্গুন। কত কবি দিয়েছেন কত সাহিত্যিক দিয়েছেন সেই বর্ণনা। কিন্তু রোগী-ঘেঁটে-খাওয়া সতু বদ্যি কোত্থেকে দেবে তার রূপের বিবরণ। তবে ফাল্গুনের রাত সবার ভালো লাগে। সতু বদ্যিরও ভালো লাগে। দক্ষিণের ঝুল বারান্দায় অলসভাবে দাঁড়িয়ে মাঠের ওপারে দেখা যায়—

সারি দেয়া সুপারির আন্দোলিত
সঘন সবুজে,
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত
কারে খুঁজে খুঁজে।

আর যদি শুক্ল পক্ষের রাত হয় তাহলে পাতলা কুয়াশায় ঢাকা চাঁদের আলো আর এই দক্ষিণের হাওয়া দুয়ে মিলে যে কবিতার সৃষ্টি করে অত ভালো কবিতা কি রবি ঠাকুরই লিখতে পেরেছেন! সেই শুক্ল পক্ষেই ডাক এসেছিল সতু বদ্যির। মাঝরাতের ডাক। বাড়ির পিছনে একটা লেভেল্ ক্রশিং আছে তার নাম ল্যাংড়া গেট। কবে নাকি একটা ল্যাংড়া গেটম্যান থাকতো। পাড়ার লোকেরা তার স্মৃতি অক্ষয় করে রেখেছে। নাম দিয়েছে ল্যাংড়া গেট। ল্যাংড়া গেট পার হয়ে আধ মাইল দূরে রুগীর বাড়ি। যাবার সময় ভাল করে ঘুম ভাঙে না। ঘুম ভাঙে রুগী দেখে। শুকনো হাড়ে মাংস জড়ানো, চোয়াল উঁচু, চোখ নীচু গর্তে। গাল নীচু, দাঁত উঁচু বাইরে—ক্ষুধার যেন প্রতিমূর্তি। যে ডাকতে এসেছে সে-ও যেমনি, যার অসুখ হয়েছে সে-ও তেমনি। দুজনেই এক রকম। অসুখটা অবিশ্যি তেমন কিছু নয় ফুড্-পয়জনিং, দাস্ত হচ্ছে আর বমি হচ্ছে। একটা এট্রোপিন্ দিতে বমিটা কমে যায়। তারপর ওষুধ লিখে দিয়েই সতু বদ্যির ছুটি। গলিতে বেরিয়ে আসে। রাত্তির বেলা মাছিরাও থাকে না। পচা ড্রেনগুলো আবছা কুয়াশায় ঢাকা। ভাট ফুলের বুনো গন্ধে পচা গন্ধটাও কোথায় ঢেকে যায়। সতু বদ্যি আর সেই লোকটি পাশাপাশি হাঁটে। লোকটি বিড় বিড় করে বকে। সতু বদ্যি কিছু শোনে কিছু শোনে না। লোকটির দাদা অর্থাৎ রোগী চাকরিটা চলে যাওয়ার পরে লোভী হয়ে উঠেছে। এমনিতে তো মোটা চালের ভাত আর শাক চচ্চড়ি ছাড়া আর কিছু জোটে না। তাইতে কাল বিয়ের নেমন্তন্নে বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ভেজিটেবলের লুচি আর মাংস। লোকটা বিড় বিড় করে, সতু মনে মনে গুন্ গুন্ করে—

বুঝিতে পারিনে কত কী শব্দ
মনে হয় যেন ধারণা।
রাতের বুকের ভিতরে কে করে
অদৃশ্য পদচারণা।

খাওয়াটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। খাবার সময় তো আর মনে ছিল না

যে পেটটা নিজের। তাইতে এখন এই গোলমাল। কী কষ্টটাই পেলে পেটের ব্যথায় আর বমিতে। তবু তো ডাক্তারবাবু দয়া করে এসেছেন। আর কেউ হলে কি আর আসতো ?

সতু বক্সি বলে, হুঁ। সামনে রাস্তা, ডোবা, সুপারি গাছ, জঙ্গল, নারকেল গাছ, নীচু নীচু বাড়ি, চাঁদের আলো, দক্ষিণে হাওয়া, কুয়াশা, চোখের আধো ঘুম সব মিলিয়ে কী যেন সৃষ্টি করে—

গাছগুলো সব ঘুমে ডুবে আছে,
তন্দ্রা তারায় তারায়,
কাছের পৃথিবী স্বপ্ন প্লাবনে
দূরের প্রান্তে হারায়।

লোকটি হঠাৎ ভূতের গল্প শুরু করে। পুজোর সময় তার বোন—বাইশ বছরের বোন—তার ভাইয়ের কারখানার এক উড়ে মিস্ত্রির সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। তার তো বিয়ে দিতে পারেনি। সে নিজেই নিজের রাস্তা করে নিয়েছে। সুখেই আছে মেয়েটি কোথায় গিয়ে যেন বিয়েও করেছে। কিন্তু ওরা কুলীন কায়স্থ, ওদের বোন বেরিয়ে গেল উড়ের সঙ্গে সেই দুঃখে তার আরেকটা ভাই ছিল সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। সে খবর তো ডাক্তারবাবু জানেন। তাকে শ্মশানে পোড়াতেও গিয়েছিল সে-দিন সতু বক্সির সাথী। তারপর থেকে ছোকরার কি যে হয়েছে একলা শুতে গেলে রাত্তির বেলায় হয়তো হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়—দেখে বাড়িতে এক কঙ্কাল ঝুলছে। একা একা হয় তো রাতের বেলা রাস্তা দিয়ে চলছে—হঠাৎ দেখে সামনে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা কঙ্কাল যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু কি বলতে পারে কেন এ রকম হয়। লোকটা আরও কাছ ঘেঁষে আসে।

সতু বক্সির সামনে দক্ষিণের হাওয়ায় সুপারি নারিকেলের গাছ দোলে। রাস্তা দোলে। সতু বক্সি উত্তর দেয় না। লোকটা আরও কাছ ঘেঁসে আসে। সতু বক্সি চমকে ওঠে। শুধু চমকায় না ধমকায়ও 'আরে অত কাছে আসছ যে ? তুমিও ভূত নও তো ?'

বড় বড় দাঁত বের করা হাসিটা ম্লান হয়ে যায়। বড্ড ম্লান হয়ে যায়। কুয়াশা ঢাকা ম্লান চাঁদের আলোর জন্যে কিনা কে জানে। না, লোকটা ভূত নয়। আঙুল দিয়ে দেখায় চাঁদের আলোয় ছায়া পড়েছে। ভূতের কি ছায়া পড়ে ? সতু বক্সি ছায়ার দিকে তাকায়। হ্যাঁ, ছায়া সত্যিই পড়েছে। লোকটারই

ছায়া কিন্তু সত্তু বস্তির হঠাৎ মনে হয় ছায়াটাই যেন একটা কঙ্কাল। চমকে সত্তু বস্তি মুখটা ফিরিয়ে নেয়। সামনে পূবের আকাশ পাতলা হয়ে আসছে কি একটু? সত্তু বস্তি কি রকম ভরসা পায়। স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। পূবের আকাশটা পাতলা হয়ে আসছে। গুনগুনিয়ে কবিতা বলে। রবি ঠাকুরের কবিতা, বড় মিষ্টি কবিতা—

প্রভাত-আলোক আকাশে-আকাশে
এ চিত্র দিবে মুছিয়া,
পরিহাসে তার অবচেতনার
বঞ্চনা যাবে ঘুচিয়া।



আলো-আঁধারি

এই গল্প বলা কি বদ্যিগিন্নীর উচিত হল? রুগী দেখা প্রসঙ্গে মালিনী মেছুনীর গল্প বলার কি সম্পর্ক থাকতে পারে বলতে পারেন? আর তাও সতু বদ্যিকে মেছুনী বানিয়ে। বদ্যিগিন্নীর কাণ্ডই ঐ রকম।

কাল থেকে ঐ রুগী বাড়িতে সতু বদ্যিকে বারবারই ডাকছে। যদি বা কখনো ফাঁক বুঝে সতু বদ্যি বাড়ি ফিরে এসেছে অমনি আবার ডেকে নিয়ে যেতে কসুর করেনি। সে দিনেই হোক আর রাত্তিরেই হোক। আজকে বিকেল বেলা ও বাড়ির পরিচিত আরেকজন ডাক্তারের হাতে কিছুক্ষণ রুগীর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সতু বদ্যি ছুটি নিয়েছে। তারপরে বেড়াতে বেরিয়েছে বদ্যিগিন্নীর সঙ্গে। বদ্যিগিন্নী' গভীর সবুজ শাড়ীতে, সাদা জামায় আর লাল জুতোতে কাজলে-কুমকুমে, ফর্সা রঙে আর কালো চুলে সেজে বেরিয়েছে। তার পাশে সতু বদ্যি গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতি পরা সত্ত্বেও চলেছে যেন একটা পিপে। তাতেও বদ্যিগিন্নী কিছু মনে করেনি কিন্তু যেতে যেতে ঠিক সেই রুগী বাড়ির সামনে এসে পা-টা কি রকম ঝিমিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েই পড়ে সতু বদ্যি। সেই যে-বাড়ি থেকে আজ বিকেল অবধি ডাকাডাকি করেছে। এখনও পাড়ার ছেলেরা ছুটোছুটি করছে। কেউ হয়তো ওষুধ আনছে, কেউ বরফ আনছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে হয়তো এমনি কখন কি দরকার লাগে। রুগী নেহাতই শিশু—আট-দশ বছর বয়স হবে হয়তো। পাড়ার গিন্নী-বান্নীরাও সে বাড়িতে ব্যস্ত। কেউ হয়তো রুগীর শুশ্রূষায়, কেউ হয়তো রুগীর মায়ের শুশ্রূষায়। প্রথম সন্তানের মৃত্যু ভয়ে ভীতা তরুণী-মা।

অপরাধের ভিতরে সতু বদ্যি একতলা ফ্ল্যাটের খোলা দরজা আর জানলা দিয়ে বারে বারেই বাড়িটার ভিতরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

তাতেই বদ্যিগিন্নী বললো, 'কী তোমার রুগী বাড়ি ছেড়ে যেতেই ইচ্ছে করে না।'

'না, তা করবে না কেন'—একটু কিন্তু কিন্তু হয়ে সতু বদ্যি বলে 'তবে দেখতে বড় ভালো লাগে। দু-শো টাকা মাইনের কেরানী আর আর আশী টাকা মাইনের মাস্টারনী বউ। শুধু তারাই নয় পাড়ার ছেলে-বুড়ো বউ-ঝি সবাই মিলে এগিয়ে এসেছে তাদের সাহায্য করতে। তারা যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়ছে—সেই দৃশ্যটা দেখতে বড় ভালো লাগে।

বদ্যিগিন্নী তা বোঝে না। তার কথায় স্পষ্ট বিরক্তির সুর। সত্যিই মূর্তিমতী বর্ষা দেবীর মত বদ্যিগিন্নীকে ফেলে ঐ সব দৃশ্য দেখতেই তো সতু বদ্যির ভালো লাগে।

না, তা নয় সতু বদ্যি আত্মপক্ষ সমর্থন করে। বর্ষা দেবীকে যে জন্যে ভালো লাগে ঠিক সেই জন্যেই ওদেরও ভালো লাগে। কবে কোন্ পূর্ব পুরুষ তার ছেলেদের উপদেশ দিয়েছিল, জীবনকে অনুসরণ করতে, মৃত্যুকে পরিহার করতে। আয়ুর্বেদকে জীবনের অবলম্বন করতে হলে নাকি ঐ পথই একমাত্র পথ। আর ঐ পথেরই সীমান্তে বদ্যিগিন্নীও আছে আর রুগী বাড়িও আছে। তাইতেই দেখতে ভালো লাগে।

সব শুনে বদ্যিগিন্নী কি না ঐ গল্প শুরু করলো।

মালিনী আর মেছুনী ছেলেবেলা থেকে সই। মেছুনী থাকে নদীর ধারে গাঁয়ের ভিতরে আর মালিনী থাকে রাজধানীতে রাজার ফুল বাগানে। মেছুনী গাঁ থেকে মাছ ধরে রাজধানীতে আসে মাছ বিক্রি করতে—আর মালিনী বাগান থেকে ফুল তুলে রাজবাড়ি সাজায়।

একদিন মেছুনীর রাজধানীতে মাছ বিক্রি করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বর্ষার দিন দুর্যোগ নেমে এল। তাইতে মালিনী বললো 'সই আমার বাড়িতে থাকো, কাল ভোর বেলা বাড়ি যেও।' মেছুনী তাতেই রাজী। কিন্তু যত রাত হয় মেছুনী তত বিছানায় ছটফট করতে থাকে। ঘুম আর তার আসে না। শেষে মালিনী বোঝে। ছেলেবেলার সই তো! মেছুনীর বিছানার পাশ থেকে ফুলের সাজিগুলো সরিয়ে নেয়। মাথার কাছে, পায়ের কাছে, নাকের কাছে, মুখের কাছে মাছের চুবড়িগুলো সাজিয়ে দেয়। তারপরে মেছুনীর ঘুম আসে। ফুলের গন্ধ কি আর মেছুনীর সহ্য হয়। বদ্যিগিন্নী গল্প শেষ করে। তেমনি সবুজে-

সাদায়-লালে সজ্জিতা বর্ষা দেবীকে কি আর সতু বদ্যির ভালো লাগবে? ভালো লাগবে ব্যথা আর জ্বর, চোখের জল আর আহা-উহু। যার যে রকম রুচি।

সতু বদ্যি আবার চলতে শুরু করে। বদ্যিগিন্নীর কথার প্রতিবাদ না করে উপায় নেই। তার রুচি সম্বন্ধে এ রকম ধারণা সতু বদ্যি কি করে সহ্য করবে। সতু বদ্যি বলে, না, তা নয়। কৈশোর থেকে যখন যৌবনে সতু বদ্যি পা দিতে শুরু করেছে, যখন সে ক্রমশই বাপ-মায়ের আদরের শৈশব ছাড়িয়ে আপন সত্তায় দাঁড়াতে শিখছে সেই সময় থেকেই সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে ঠিক করলো—মৃত্যুকেই অনুসরণ করবে, জীবনকে পরিহার করবে। সতু বদ্যির পূর্বপুরুষ ধন্বন্তরীর উপদেশ: জীবনকে অনুসরণ করো, মৃত্যুকে পরিহার করো। সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে সেই উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা শুরু করলো। ১৯৩৯ সালে ইওরোপে যুদ্ধ শুরু হল। দিনের পর দিন খবরের কাগজে যুদ্ধ আর মৃত্যু, হত আর আহতের খবর বেরুতে লাগল। সবাই—সতু বদ্যির সহপাঠী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিকৃত খুশির আনন্দে হুমড়ি খেয়ে খবরের কাগজে মৃত্যুর সংবাদ পড়ল। জাপানী যুদ্ধ শুরু হল। কলকাতায় বোমা পড়ল। ডজন ডজন হতাহত সতু বদ্যিদের হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিল। ছাত্র সতু বদ্যি তাদের বীভৎস আঘাতচিহ্ন দেখে শিউরে উঠতো। কিন্তু সেই শেষ নয়, তার ওপরে এল দুর্ভিক্ষ। এক ফোঁটা ফ্যানের জন্যে মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে কেঁদে মানুষ মরে গেল। মহামারী এল। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। তারপরে যুদ্ধ শেষ হল। বিদেশী শাসকের গুলিতে কলকাতার রাস্তা মানুষের রক্তে রাঙিয়ে উঠল। চারদিকে কেবল মৃত্যু, মৃত্যু—মৃত্যু। দানবেরা যেন বন্দুকের গুলির শব্দে উল্লসিত হয়ে অট্টহাস্য করত 'জীবনকে পরিহার করো, মৃত্যুকে অনুসরণ করো।'

কিন্তু আরও ছিল। একদিন দুপুরবেলা কলকাতা শহরে দাঙ্গা শুরু হল। চরম বীভৎসায় মৃত্যুর দূতেরা যেন উল্লাসে মহানগরীর রাস্তায় নৃত্য করতে লাগল। সে আক্রমণে মানুষ আর মনুষ্যত্ব সব যে কোথায় গেল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। উনিশ-শ উনচল্লিশ সালে যা শুরু হয়েছিল সাত বছর বাদে তা যেন চরম শিখরে পৌঁছলো।

কাকভুষণ্ডী চার যুগ অমর। তাকে কলিযুগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সে কি রকম রক্ত পান করেছে। তার উত্তরে কাকভূষণ্ডী বলেছিল যে রাম রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল তাতে সে রক্তে সাঁতার কেটেছে আর রণচণ্ডী দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তাতে সে ডুবে ডুবে রক্ত পান করেছে। কিন্তু ছোঁড়ারা যে মারামারি করেছিল যাকে লোকে কুরুক্ষেত্তর না কি যুদ্ধ বলে তাতে তার ঠোঁটও ডোবেনি।

দাঙ্গার প্রথম কয়েকদিন কেবল সতু বস্থির মনে হত—গত সাত বছরে যা দেখেছে তা হয়তো ছোকরাদের কুরুক্ষেত্তর কিংবা বড জোর রাম-রাবণের যুদ্ধ কিন্তু সত্যিকারের রণচণ্ডীর লীলা সবে শুরু হল।

হিন্দু পাড়ায়, মুসলমান পাড়ায়, বাঙালী পাড়ায়, অবাঙালী পাড়ায়, বড রাস্তায় গলিতে সর্বত্র মৃত্যুর বীভৎসা করাল রূপে নৃত্য শুরু করেছিল। সতু বস্থি এক এক করে শিখলো ভারি লাঠি দিয়ে এক আঘাতেই মানুষকে হত্যা করা যায়। আবার হাল্কা লাঠি দিয়ে ধীরে সুস্থে ক্ষেপা কুকুরের মত মানুষকে হত্যা করা যায়। খাঁড়ার মত ধারালো ছুরি দিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া যায় মানুষের জীবন নেবার সময়ে। আবার ছোট্ট ছুরি দিয়ে মুরগীর মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জবাইও করা যায়। শিশুর জন্মে শাঁখের আওয়াজে উলু-ধ্বনিতে যে-গলি সতু বস্থি মুখরিত হতে দেখেছে সেই গলিকে মৃত্যুর তাণ্ডবে মুখর হতে দেখতে হল। মনুষ্যত্ব চোরের মত লুকিয়ে হয়তো রাতের অন্ধকারে হয়তো কোন গৃহকোণে অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল সেদিন।

যে রাস্তা সতু বস্থি বারোয়ারী পূজার দিন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রঙীন কাগজে পাতায় ফুলে ঘটে আর আল্পনায় সাজিয়েছে সেই রাস্তাতেই সতু বস্থি আল্পনার পদ্মের ঢঙে সযত্নে সজ্জিত অর্ধ গলিত মৃতদেহ দেখেছে। যে আবর্জনার গাড়ি জীবাণুর ডিপো বলে সতু বস্থি কখনো ছোঁয়ওনি সেই আবর্জনার গাড়িতে স্তূপীকৃত মানুষের মৃতদেহ, বালকের মৃতদেহ, নারীর মৃতদেহ, শিশুর মৃতদেহ নিকৃষ্ট জঞ্জালের মত খালে কিংবা নদীতে মাঠে-ঘাটে ফেলে দিয়ে আসতে দেখেছে।

সেই যে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতো, দিনের আলোয় বেরুতে সাহস পেত না সতু বস্থি লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক সময় তাদেরও দেখেছে। রাস্তায় চলা কলেজের তরুণ-তরুণীদের দিকে ক্ষণিকের চোরা চাউনির মত একবার দেখেই হয়তো চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। উপায় কি? দুরন্ত পিশাচ যদি জানতে পারে তাহলে মানুষকে হত্যা করবে, মনুষ্যত্বকে হত্যা করবে, সতু

বস্থিকেও হত্যা করবে।

এখনো মনে পড়ে অন্ধকার সিঁড়ি কোঠায় দরজায় ঠেসান দিয়ে কম্পমান বিধর্মী আশ্রয়প্রার্থী শিশুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সতু বস্থি ভেবেছিল যদি কখনো দিন আসে তাহলে আর কিছু নয় দু-চোখ ভরে তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষ দেখবে। মনুষ্যত্ব দেখবে। লক্ষ কোটি চোখ তো আর সতু বস্থির নেই, হবেও না। যদি হত তাহলে সেই লক্ষ কোটি চোখ দিয়েই দেখত।

বস্থিগিন্নী আরও চটে যায়। বলে, এসব নাকি তার সস্তা কবিত্ব। বলে, অন্ধকারে আলোকে আড়াল করে আঁচল দিয়ে মনুষ্যত্বকে লুকিয়ে রাখা ভালো কবিত্ব হতে পারে কিন্তু বাস্তব নয়। আসলে সতু বস্থির রুচিই ঐ রকম। সে চায় ঐ রোগ আর রুগী, উদ্বেগ আর উত্তেজনা, দুঃখ আর কান্না—এসবই পছন্দ করে সে। সেই মেছুনীর গল্প আর কি।

শেষ পর্যন্ত সতু বস্থিকে বাধ্য হয়েই গল্প বলতে হয়। ঠিক গল্প নয় কি করে আঁচল দিয়ে মানুষের দরদ আড়াল করে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল সেই গল্প বিবৃত করতে হয়। মেয়েমানুষ তো—মোটা কথা ছাড়া কিছু বোঝে না। ১৯৪৬ সালে ১৬ই অগস্ট কলকাতার এক পল্লীতে ছোট্ট একটা মেসে সতু বস্থিরা থাকতো। ময়দানে নাকি মুসলিম লীগ থেকে সভা ডেকেছে। সেই সভায় বিরাট কিছু একটা বোধ হয় হবে। তবে কি কারণে যেন সেদিন ছুটি ছিল এখন মনে পড়ে না তবে একথা মনে পড়ে অলস মধ্যাহ্নে মেঝেতে মাদুর পেতে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে তখন সতু বস্থি উপন্যাস পড়ছিল। কি উপন্যাস তা মনে পড়ে না তবে এ কথা মনে পড়ে হঠাৎ রাস্তার ওপরে হৈ হৈ শব্দে উপন্যাসের মধুর রস ভঙ্গ হওয়াতে সতু বদ্যি বড় বিরক্ত হয়েছিল। হৈ হৈ-টা ক্রমশই বাড়তে লাগলো। অগত্যা সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নীচে গিয়ে রাস্তায় নেমে দেখতে হল ব্যাপারটা কি! না, কিছু নয়, ময়দান থেকে কিছু বিধর্মী মিছিল করে ফিরছিল তারা নাকি তাড়া করে এসেছে। পাড়ার ছেলেরা আবার তাদের পাল্টা তাড়া করে গলি পার করে দিয়ে এসেছে। সতু বদ্যি আবার দোতলার ঘরে এসে মাদুর পেতে শোয়। বুকের তলায় বালিশ, চোখের তলায় উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসে আর মন বসে না। সারা পাড়ায় কী রকম একটা থমথমে ভাব আর মাঝে মাঝে দূরাগত উত্তেজনার আভাস।

থমথমে ভাবটা কাটলো একেবারে সতু বদ্যিদের মেস বাড়ির দোরগোড়ায়

বিরাট এক হল্লায়। সতু বদ্যি আর জ্যাঠা দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। ব্যাপারটা কি দেখতে।

সতু বদ্যিদের মেস বাড়ির দরজার পাশে পাশের বাড়ির একটা ছোট বারান্দায় টিন দিয়ে ঘেরা একটা ঘর ছিল। সেই ঘরে একটা বিধর্মী বিড়িওয়ালা পান আর বিড়ি বিক্রি করতো। সে দিন সে ঘরের সামনের ঝাঁপটা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। তার সামনে এক বিরাট দল জড়ো হয়েছে। তাদের ভিতরে বাঙালী আছে হিন্দুস্থানী আছে। তারা লাঠি ডাণ্ডা থেকে শুরু করে ছোরা ছুরি পর্যন্ত নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঐ ঘরটা আক্রমণ করেছে। সামান্য একটা হয়তো পাঁচ ফুট লম্বা চার ফুট চওড়া ঘর আর সেটা আক্রমণ করেছে অন্তত দু-তিনশ সশস্ত্র লোক। সতু বদ্যিরা যখন গিয়ে পেঁছিলো তখন পাশের বাড়ির একটি ছেলে কোনরকমে হাত উঁচু করে আক্রমণকারীদের বোঝাতে চেষ্টা করছে যে, ঘরটা তার আর সে বিধর্মী নয় সুতরাং ও ঘর আক্রমণ করা উচিত নয়। আক্রমণকারীরা বলছে, সে বাড়িওয়ালা হতে পারে কিন্তু দোকানটা তো বিধর্মীর। সে জন্যে সেটা লুট করতেই হবে। আর ভিতরে রয়েছে যারা তাদেরও বার করে নিয়ে এসে শাস্তি দিতে হবে।

পাশের বাড়ির ছেলেটি কিরকম ইতস্তত করছিল। তার যে দিন থেকে জ্ঞান হয়েছে সে দিন থেকে আজ পনের-কুড়ি বছর পর্যন্ত ঐ ভাড়াটেরা রয়েছে। কী করে সে তাদের ধনে প্রাণে বিনাশের সাহায্য করে।

এ সময় বিদ্যুৎ গতিতে কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল যা সতু বদ্যি আশঙ্কাই করেনি। হঠাৎ আক্রমণকারীদের লাঠির একটা ঘা গিয়ে পড়ল পাশের বাড়ির ছেলেটির মাথায়, ছেলেটি আর্তনাদ করে পড়ে গেল। আহত বিধর্মী নয় বলে আক্রমণকারীরা একটু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো—সেই ফাঁকে জ্যাঠা ঘরটার পেছন দিকের একটা পাল্লা খুলে চারজন বিধর্মীকে সোজা মেসের ভিতর নিয়ে গেল। আর সতু বদ্যি পাশের বাড়ির ছেলেটিকে পাঁজা কোলা করে মেসের ভিতরে চলে এল।

এত বড় ব্যাপার ঘটে গেল যেন কয়েক মুহূর্তে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসবার সময় সতু বদ্যি কি জ্যাঠা কেউ ভাবেওনি যে এরকম একটা কিছু ঘটবে। বিধর্মী চারজনকে নিয়ে সিঁড়িকোঠায় ঢোকানোর সময়ও তারা ভাবেনি কি বুঝতেও পারেনি কি পর্ব শুরু হল।

সেই বিকেল থেকে পাড়ায় বিধর্মীনিধন যজ্ঞ শুরু হল, ঠিক যেমন শুরু হল অন্য ধর্মাবলম্বীদের পাড়ায়ও বিধর্মী নিধন। এসব তো বস্তিগিন্নী নিশ্চয়ই জানে। সেই দুর্দিনের খবর কে না জানে?

তবে বস্তিগিন্নী হয়তো জানে না—তারপরে ঐ ছোট্ট মেসটার চার পাশে আর তার ভিতরে সেদিন বিকেল থেকে কী নাটক শুরু হল। সিঁড়ির এক পাশে পাশের বাড়ির আহত ছেলেটিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বেঁহুশ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া তখন আর সম্ভব নয়। রুগীর অবস্থার জন্যে নয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যে। সিঁড়ির আর এক পাশে মাঝবয়সী বিধর্মী বিড়িওয়ালা আর দশ থেকে কুড়ি বছরের ভিতরে বয়স এরকম তিনজন সহকর্মী প্রাণের আশঙ্কায় কম্পমান। কখনও কখনও আধঘণ্টা কখনও একঘণ্টা বাদে দলের পর দল সশস্ত্র লোক সেই মেস বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে। তাদের দাবি বাড়িতে নিশ্চয়ই চারজন বিধর্মী আছে তাদের বার করে দিতে হবে। মেসের অধিবাসীরা বিধর্মীর অস্তিত্ব আগাগোড়াই অস্বীকার করে। প্রথম কয়েকবার আক্রমণকারীরা তাইতেই ফিরে গেল কিন্তু তারপর তারা আবার ফিরে এল বাড়ি খানা-তল্লাশী করবে বলে। তারা বিশ্বাস করে না যে বাড়িতে বিধর্মী নেই। মেসের ছেলেরা পাশের বাড়ির ছেলের আহত অবস্থা দেখিয়ে অনুরোধ করে খানাতল্লাশী হোক কিন্তু একদিন বাদে। ছেলেটির অবস্থা বড়ই শোচনীয় মাথায় আঘাত লেগেছে। বেশী গোলমাল হলে সে আর বাঁচবে না।

অনুরোধ রক্ষিত হয়। কিন্তু বারে বারে কখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় কখনও বা তারও আগে আক্রমণকারীরা হানা দেয়—জানতে চায় ছেলেটির জীবনের আশঙ্কা কেটেছে কিনা? কাটলে তারা বাড়ি খানাতল্লাশী করবে।

সে রাত্রির কথা সতু বস্তি অনেকদিন ভুলবে না। সিঁড়ির দু-পাশে দু-ঘরে আহত আর বধ্যভূমির যাত্রী আর সমস্ত পাড়ার বাইরে আরও দূরে বীভৎস চিৎকার। ঘাতকের উল্লাস আর হতভাগ্যের আর্তনাদ। অন্ধকার হলে কাছে আর দূরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের চাইতেও সহজ ও সাবলীল ভাবে বিধর্মী হত্যা চলতে থাকে। শুধু যে যারা বিধর্মী তারাই হত হয় তা নয় বিধর্মীদের যারা আশ্রয় দিয়েছে তাদের ওপরেও আক্রমণ চলে। সতু বস্তি আর জ্যাঠা সিঁড়ি কোঠার ভিতরে পিছন দিকে দরজা বন্ধ করে নিবু-নিবু মোমবাতি জ্বালিয়ে ফিস ফিস করে চোরের মত দশ বছরের

শিশুকে আর পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়কে ভাত আর নুন খেতে দেয়।

সেই দু-দিন সেই অন্ধকার—সতু বদ্যিদের কাছে যেন সাত বছরের ভিতরে চরম অন্ধকার। সে দু-দিন সতু বদ্যিদের পাড়াতে কাকভূষণ্ডী ডুবে ডুবে রক্ত খেল। বিধর্মীরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও পাড়ায় অনেক ছিল।

চার—পাশে উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে, পশ্চিমে—উর্ধ্বদেশে, অধঃদেশে পিশাচেরা যেন বিজয় উৎসবে গর্জন করতে লাগলো: মৃত্যুকে অনুসরণ করো, জীবনকে পরিহার করো।

সতু বদ্যির কোন পূর্বপুরুষকে তার কোন গুরুদেব কানে মন্ত্রদান করেছিল: জীবনকে অনুসরণ করো, মৃত্যুকে পরিহার করো। কাঙালের সামান্য সম্পদের মত পূর্বপুরুষের সেই আদেশকে বুকের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে সেই আদেশ অনুসরণের অপরাধে কম্পমান সতু বদ্যি সিঁড়ি কোঠার ভিতরে অন্ধকারে চারজন বিধর্মী আর তাদের মলমূত্র পরিবৃত হয়ে তার পূর্বপুরুষ ধন্বন্তরীকে স্মরণ করেছে আর প্রার্থনা করেছে—একটু আলোও কি পাবো না—একটু আলো—সামান্য আলোর রশ্মি!

যুগে যুগে কবি আর সাহিত্যিকরা বলেছেন, প্রেমের মৃত্যুই মানুষের জীবনে চরম অভিশাপ। সে দিন সতু বদ্যি সেই কথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের মৃত্যুর চাইতে বড় অভিশাপ মানুষের জীবনে আর কিছু নেই।

গল্প করতে করতে লেক চলে আসে। জলের ধারে ঘাসের ওপরে রাস্তায় পরীর ছানাদের মত ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা করে। কিন্নরমিথুনের মত পুরুষ আর নারী হয়তো জোড়ে জোড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। সতু বদ্যি তাকিয়ে থাকে, বদ্যিগিন্নীও তাকিয়ে থাকে।

বদ্যিগিন্নী বলে 'এ তো অন্ধকারের গল্প তারপর সেই যে আলোর রেখা দেখেছিলে তার কি হল?' অত শত ফ্যানানো কবিত্ব বদ্যিগিন্নী বোঝে না।

সতু বদ্যি আবার বলতে শুরু করে—

তখন ওদের অবস্থা হয়েছে বিধর্মীদের যদি ছেড়ে দেয়া যায় তাহলে তাদের যে শুধু নিশ্চিত মৃত্যু হবে তাই নয় মেসের ছেলেদেরও মৃত্যু নিশ্চিত। বিধর্মীদের আশ্রয় দেওয়া তখন মৃত্যুদণ্ডার্হ অপরাধ। আটচল্লিশ ঘণ্টায় যেন সতু বদ্যিরা যমের দক্ষিণদুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে সময়ে মনে পড়লো পাড়ার মেশোমশাই-এর কথা। ভদ্রলোক জাতে বৈদিক ব্রাহ্মণ, মাথায় টিকি, গলায় পৈতে,

পায়ে চটি সব মিলে রীতিমত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একজন প্রতিনিধি। তিনি সতু বদ্যিদের ভালোও বাসেন আর পাড়ার লোকেও তাঁকে মানে। তিনি যদি কোন উপায় করতে পারেন। সতু বদ্যি আর জ্যাঠা দুজনে মিলে মেশোমশাইয়ের কাছে গিয়ে হাজির হয়।

মেশোমশাই-এর মুখে উত্তেজনার চিহ্ন বেশ বিশদ ভাবে বর্তমান। শুধু উত্তেজনাই নয় উদ্বেগ, রাতজাগা—সমস্ত লক্ষণই মেশোমশাইর মুখে যেন আঁকা রয়েছে। কাঁচাপাকা লম্বা লম্বা দাড়ি আর দন্তহীন মাড়ি থাকা সত্ত্বেও।

তাদের কুশল প্রশ্নের আগেই মেশোমশাই নিজেই প্রশ্ন করে বসলেন, সতু বদ্যিরা ভালো আছে তো? জ্যাঠা ভালো তো?

সতু বদ্যিরা ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ, ভালোই আছে সবাই।

শুনে মেশোমশাই একটু আশ্বস্ত হন। ভালো থাকলেই ভালো। মেশোমশাই বড় বিপদে পড়েছেন তাদের বাড়ির সামনে কতগুলো বিধর্মীদের বস্তি ছিল গতকাল লোকে সেই বস্তিটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। মায়ের কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে শুরু করে অথর্ব বৃদ্ধ পর্যন্ত একটি একটি করে লাঠি ছুরি দিয়ে বড় রাস্তার ওপরে দিনের আলোতে প্রত্যেককে পশুর মত হত্যা করা হয়েছে। সেই আর্তনাদে আর বীভৎসায় মেশোমশাই বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু শুধু তাই নয় মেশোমশাই-এর একটি মেয়ে আছে কলেজে পড়ে, তারপর থেকে সে উন্মাদ—পাগল হয়ে গিয়েছে। এই কথার পিঠে সতু বস্তিদেরও কথা পাড়তে সুবিধে হয়। চার পাশে তাকিয়ে কোন লোকজন আছে কি না দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে জ্যাঠা পুরো ঘটনাটা বিবৃত করে। তারপরে বলে, মেশোমশাই কি কোন উপায় করতে পারেন?

পরামর্শ করে স্থির হয় সারা শহর তো সৈন্যদের অধীনে চলে গেছে আর সান্ধ্য আইন আটটা থেকে চারটে পর্যন্ত জারী হয়েছে। সুতরাং সেদিন রাত্রে মেসের ছেলেরা বিধর্মীদের দাড়ি টাড়ি কামিয়ে যতদূর সম্ভব মানানসই পোশাক পরিয়ে প্রস্তুত করে রাখবে। আর সান্ধ্য আইন শেষ হলেই ভোর রাত্তিরে চারটে থেকে সোয়া চারটের ভিতরে মেসের পিছনের দরজায় গিয়ে মেশোমশাই দু-বার হরেকেষ্ট বলে ডাক দেবেন আর তখন সতু বদ্যিরা চার-জন বিধর্মীকে পিছনের দরজা দিয়ে বার করে দেবে।

সেদিন শেষ রাতে মেশোমশাই ঠিকই এলেন, হরেকেষ্ট বলে ডাকও দিলেন। আর ওদের নিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন ফিরতি পথে কি হয় জানিয়ে

যাবেন। মেস থেকে থানায় যেতে আসতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না। সুতরাং মেসের ছেলেরা অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু আধঘণ্টা যায়, একঘণ্টা যায়, দেড়ঘণ্টা যায়, মেশোমশাই আর ফেরেন না। ছেলেরা ক্রমশই উদ্বিগ্ন হতে থাকে। চারজন বিধর্মী আর মেশোমশাই—পাঁচজন হল। ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে সৈন্যরা মেশোমশাইকে গুলি করেনি তো? পাড়ার লোকেরা টের পেয়ে কোন গলি-টলি যেখানে সৈন্য নেই সেখানে মেশোমশাইকে বিধর্মীসমেত খুন করেনি তো? সবাই নিজেকে অপরাধী বোধ করতে থাকে। মনে হয় তাদের মত কয়েকটা অর্বাচীনকে বাঁচাতে গিয়ে পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ হয়তো প্রাণই দিলেন।

মেশোমশাই ফেরেন প্রায় তিন ঘণ্টা বাদে। ঘরের ভিতরে ঢোকেন কিন্তু বসেন না। ম্লেচ্ছদের ছুঁয়েছেন, তাঁর গা ঘিন্-ঘিন্ করছে। স্নান না করে আর সোয়াস্তি পাবেন না তাইতে বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান করবেন।

না, মেশোর সে রকম কোন বিপদ হয়নি। প্রথমে মেশো থানাতেই দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষে মনে হল থানার প্রধান কর্মচারী যদি বিধর্মী না হন তা হলে কি ওদের জীবন রক্ষা পাবে? তাইতে অনেক ঘুরে ঘুরে এ-গলি সে-গলি দিয়ে ঐ যে খালের ধারে বিধর্মীদের একটা বড় বস্তি আছে যে বস্তিটা এখনও কেউ জ্বালাতে পারেনি সেই বস্তিতে গিয়ে মাতব্বরের হাতে ঐ চারজনকে দিয়ে এসেছেন।

মেসের ছেলেরা শিউরে ওঠে। আজকের এই আবহাওয়ায় ঐ বস্তির ভিতরে মেশোমশাই গিয়েছিলেন—যদি ওরা বিধর্মী বলে মেশোমশাইকে হত্যা করতো। আজ তো আর কারো কোন যুক্তি নেই।

মেশোমশাই হাসেন। তাঁর তো কোন উপায় ছিল না। এই সব বিধর্মী ম্লেচ্ছ এদের তো জীবনের কোন দাম নেই কিন্তু এদের যদি কেউ হত্যা করে তা হলে মূল্যহীন কয়েকটা জীবনের জন্যে মেশোমশাইকে হয়তো পাপের ভাগী হতে হত তাইতেই মেশোমশাইকে এই ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে হয়েছে।

সাদা সাদা দাড়ি গোঁফের ভিতর দিয়ে দন্তহীন মাড়িতে মেশোমশাই ম্লান হাসেন।

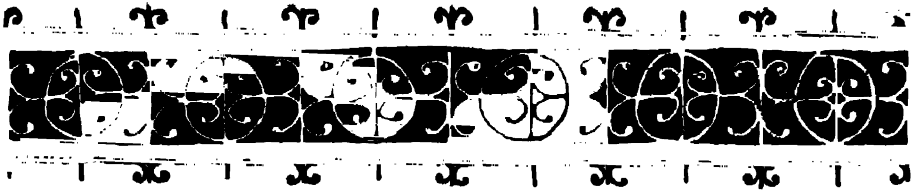
পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধের সেই ম্লান হাসিতে সতু বন্দি ঘরের কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে আলোর রশ্মি দেখেছিল। আর তখন ভেবেছিল যে তার আশা তার আকাঙ্ক্ষার এই রশ্মি আরও বড় হবে অনেক বড় হবে, সারা পাড়া, সারা

শহর, সারা দেশ, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীতে দাঙ্গা থাকবে না, যুদ্ধ থাকবে না, হানাহানি-খুনোখুনি থাকবে না আর সেই আলোর দিকে ঘরের কোণ থেকে চোরের মত তাকাতে হবে না। বড় রাস্তার ওপরে সবার সঙ্গে মিলেমিশে শুধু দু-চোখে নয় লক্ষ কোটি চোখ নিয়ে সেই আলো দেখবে। আর সমস্ত পৃথিবীতে নাদমন্ত্রের মত আবহ সঙ্গীত বাজবে : জীবনকে অনুসরণ করো, মৃত্যুকে পরিহার করো।

সুতরাং আজ মৃত্যুপথযাত্রী শিশু আর তার মায়ের সাহায্যে যখন তার পড়শীরা সাহায্য করতে এগিয়ে যায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে এবং যখন সতু বদ্যি জানে সেই রুগী এবং তার মা স্বধর্মী নয় তখন সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সতু বদ্যি আর চোখ ফেরাতে পারে না।

ভয় হয় যদি পিশাচরা আবার নাচতে থাকে, যদি আবার দাঙ্গা হয়, যুদ্ধ হয়, যদি আবার কাকভুষণ্ডী ডুবে ডুবে রক্ত খায় তাহলে তো এ আলো আর দেখা যাবে না।

সতু বদ্যি অত অন্ধকার দেখেছে কি না তাইতে আর আলো ছাড়তে ইচ্ছে করে না।



শরতের মেঘ

চীন দেশের অক্ষরগুলো সব ছবির মত। এক একটা ছবি দিয়ে এক একটা জিনিস বোঝানো হয়। তার ভিতরে যে-অক্ষরটা দিয়ে মেয়েমানুষ বোঝায় সেই অক্ষরটাই পাশাপাশি তিনবার লিখলে নাকি বোঝায় ঝগড়া।

চীনে ভাষা সতু বক্সি জানে না—সুতরাং এই অক্ষরতত্ত্ব অর্থাৎ মেয়ে-মানুষ আর ঝগড়ার এই সম্পর্ক কতটা সত্যি তাও সতু বক্সি জানে না। তবে সত্যি হওয়াই সম্ভব কারণ জ্ঞানের এমন সহজ প্রকাশ পাঁচ হাজার বছরের সভ্য চীনে ছাড়া আর কোথায় সম্ভব?

মিত্তিরদের বাড়ির প্যাঁচে পড়ে চীনেদের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে সতু বক্সির শ্রদ্ধা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। মিত্তির মশাই মোটামুটি ভালোই চাকরি করেন। ধনী না হলেও সচ্ছল অবস্থা। তাঁর বাড়িতে সব সুদ্ধ পাঁচটি প্রাণী। তার ভিতরে তিনজন স্ত্রীজাতীয়া আর দুজন পুরুষজাতীয়। পুরুষের ভিতরে মিত্তির মশাই আর ঠাকুর অর্থাৎ রসুই-এ বামুন। আর স্ত্রীজাতির ভিতরে মিত্তির গিন্নী, তাঁদের পুরনো ঝি সরো আর তাঁদের বাচ্চা মেয়ে খুকু।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করতে পঞ্চ পাণ্ডবের দরকার হয়েছিল নিরানব্বুইজন ভাই সমেত দুর্যোধনের আর অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর কিন্তু মিত্তিরদের বাড়িতে অতশত প্রয়োজন নেই। মিত্তির গিন্নী, সরো আর খুকু একত্র হলেই কুরুক্ষেত্র রোজই লেগে থাকবে।

ধরুন মিত্তির গিন্নীর শরীর খারাপ খুকুকে স্নান করাবে সরো। তখন চৈত্র মাস। মিত্তির গিন্নী লেখাপড়া শিখেছেন—পাড়ার সতু বক্সি থেকে শুরু করে শহরের ডাকসাইটে শিশু চিকিৎসক পর্যন্ত সবই ঘেঁটে দেখেছেন। তিনি স্থির করেছেন খুকুকে কলের জলে স্নান করানোই ঠিক। গরম জল মিশিয়ে স্নান করালে খুকুর ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা কমে

যাবে ফলে বারে বারেই সর্দি কাশিতে ভুগবে। সুতরাং সরোর ওপরে সেই রকমই হুকুম হয়েছে।

কিন্তু সরো গরম জল মিশিয়েই খুকুকে স্নান করিয়েছে। খুকুর সেটা পছন্দ হয়নি। চৈত্র মাসে গরম জল ভালো লাগে? সুতরাং মাকে গিয়ে সে খবরটা দিয়ে এসেছে।

তারপরেই বাড়িতে কুরুক্ষেত্র। কোথায় রইল মিত্তির গিন্নীর শরীর খারাপ আর কোথায় রইল তার শিক্ষা। সরোই বা কম কিসে। মিত্তির গিন্নী তো সেদিনকার মেয়ে। সরোই উদ্যোগ করে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। মিত্তির মশাই যখন খুকুর মত ছিলেন তাঁকে ঐ সরোই স্নান করিয়েছে। বাচ্চাদের কি করে স্নান করাতে হয় তা আজ সরোকে শিখতে হবে? তাও আবার কার কাছে না ঐ পুঁচকে বউ-এর কাছে।

সে কি সোজা কুরুক্ষেত্র। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ মিত্তির বউ আর বুড়ী সরো কারো স্নানাহার পর্যন্ত হল না। পাড়ার কাক চিলের খবর অবিশ্যি সতু বদ্যি বলতে পারে না।

কিংবা ধরুন সরোর বাজার করা। মিত্তির গিন্নী সদ্য বিলিতি পত্রিকায় পড়েছেন, মিষ্টি খেলেই মেদ বৃদ্ধি হয় আর মেদবৃদ্ধি হলে রক্তের চাপবৃদ্ধি হয়, হৃৎপিণ্ডের পেশীতে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ইত্যাদি নানারকম ব্যাধি হয়। এক কথায় আয়ুক্ষয় হয়। সুতরাং সরোকে বাজার যাওয়ার সময় মিত্তির গিন্নী সেই রকম উপদেশই দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সরো বাজার থেকে আসার সময়ে তার খোকা অর্থাৎ মিত্তির মশাই-এর জন্যে সন্দেশ আর রাবড়ি আনতে ভোলে না। তারপর বাজার ফিরতি সেই রাবড়ি আর সন্দেশ নিয়ে আর এক প্রস্ত লঙ্কা কাণ্ড। অশিক্ষিত সরোর আস্পর্ধা দেখে মিত্তির বউ-এর শুধু পিত্তি নয় হাড়পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। তেমনি সে-দিনকার পুঁচকে বউ চার বছর কি পাঁচ বছর হল এসেছে যাকে অর্বাচীন বললেই হয় সে সরোকে শেখাতে এসেছে খোকাকে কি খাওয়াতে হবে আর কি না-খাওয়াতে হবে। আস্পর্ধা দেখে সরোও তাজ্জব হয়ে গেছে। আর শুধু কি সরো তাজ্জব হয়েছে? সন্দেশ আর রাবড়ি নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড হতে দেখে পড়শীরাও তাজ্জব হয়ে গেছে—মায় সতু বদ্যি পর্যন্ত।

তাইতে সতু বদ্যি ভাবছিল যে ভাগ্যে খ্রীষ্টানদের ভগবান একখানা হাড় দিয়ে মেয়েমানুষ বানিয়ে ছিলেন। যদি পুরুষমানুষের মত সব কটা হাড়

লাগিয়ে দিতেন তাহলে তো রক্ষা ছিল না। এক হাড়েরই এই তেজ !

স্ত্রীতত্ত্ব সম্বন্ধে অবিশ্যি সতু বদ্যি তার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকের মতকেই শ্রদ্ধা করে বেশী। তিনি বলতেন যে পুরুষ জাতির দেহ গঠনে অনেক রকম তন্তুর প্রয়োজন। চামড়া, রক্ত, মাংস, স্নায়ু হাড় ইত্যাদি কিন্তু স্ত্রী জাতির দেহ তৈরি হয়েছে মোটামুটি একটি তন্তু দিয়ে সেটি হল স্নায়ু (নার্ভ)। তাদের দেহ মানে খালি বৈদ্যুতিক তারের মত প্যাঁচানো প্যাঁচানো স্নায়ু। কোথায় ছুঁলে যে কখন শক লাগবে তা বলা শিবেরও অসাধ্য।

তা ছাড়া খুকুর দুধ খাওয়া নিয়ে এমন ফৌজদারী হতে পারে ? কিছু দিন হল খুকুর একটু সাদাটে দাস্ত হচ্ছিল। ওরা তাইতে খুকুকে সতু বদ্যির কাছে নিয়ে এসেছিল। খুকুকে পরীক্ষা করে সতু বদ্যি বলেছিল যে, খুকুর তেমন কোন অসুখ নেই তবে ঐটুকু মেয়েকে দেড়সের থেকে দু-সের দুধ খাওয়ান হচ্ছে সেটা সে হজম করতে পারছে না। তাই দুধের পরিমাণটা কমিয়ে এক সেরের নীচে নামিয়ে নিয়ে আসা দরকার। তা হলে দুধের হজম-না-হওয়া স্নেহ পদার্থ দাস্তের সঙ্গে আর বেরুবে না—আর দাস্ত সাদা হবে না।

মিত্তির গিন্নী তাই করেছিলেন। করেছিলেন মানে সরোকে তাই করার হুকুম দিয়েছিলেন। খুকুটা আবার এমন হয়েছে সরোর কাছে ছাড়া স্নান করবে না, সরোর কাছে ছাড়া খাবে না, সরোর কাছে ছাড়া ঘুমুবে না—এমনি।

কিন্তু কয়েকদিন বাদেও মিত্তির বউ লক্ষ্য করলেন খুকুর দাস্ত যেমন সাদা তেমনি সাদাই রয়ে গেছে। তখন সরোকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারা গেল সরো খুকুকে দেড় সের দুধই খাওয়াচ্ছে। এক সের খুকুর বরাদ্দ দুধ আর আধ সের সরোর নিজের জন্যে বরাদ্দ দুধ। সরো আবার একটু একটু আফিম খায় কিনা সেই জন্যে সরোর খোকা অর্থাৎ মিত্তির মশাই সরোর জন্যে আধসের করে দুধ বরাদ্দ করে দিয়েছেন।

মিত্তির বউ আর সব সহ্য করতে পারেন কিন্তু খুকুর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবে এ তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। সুতরাং এবার মিত্তির বউ সরোকে সোজাসুজি বুঝিয়ে দেন, খুকু তাঁর মেয়ে সুতরাং তাঁর নির্দেশ

অনুসারে খুকুকে দেখাশোনা করতে পারে তো ভালো আর যদি না পারে তো দরকার নেই। তারপরেই শুরু হয় লঙ্কাকাণ্ড।

সরো ভালো করে গাছকোমর বেঁধে নেয়। কোমরের কাছে বেঁকে যাওয়া দেহটাকে সোজা করতে গিয়ে দেহটা হাঁটু-ভাঙা হয়ে যায়। ভাঙা গালটা ফোলানোর চেষ্টা করে। দন্তহীন মাড়ি প্রকট হয়। তারপর শুরু হয় বাক্য। সরো মিত্তির গিন্নীর শাশুড়ীর সঙ্গে এসেছিল। মিত্তির শাশুড়ীর চাইতে সরো বয়সে বড়। মিত্তির বউএর শাশুড়ীকে সারাজীবন দেখাশোনা করেছে, খোকা অর্থাৎ মিত্তির মশাইকেও দেখাশোনা করেছে। আর খোকার খুকুকেও দেখাশোনা করছে। সুতরাং সরো জানে মিত্তির বাড়ির ছেলেমেয়ে রোজ দু-বেলা আড়াই সের দুধ খায়, খেয়েছে এবং খেতে পারে। মিত্তির গুষ্টি তো আর মিত্তির বউ-এর বাপের বাড়ির মত হা-ঘরে দৃষ্টিকৃপণ গুষ্টি নয়।

বাপের বাড়ির সম্বন্ধে এ জাতীয় মন্তব্য মিত্তির বউ কেন কোন বউই করতে পারবে না। সুতরাং মিত্তির বউ গলাটা আর এক পর্দা চড়ান এবং সরোকে সাবধান করে দেন ভবিষ্যতে এরকম কথা সরো যদি বলে তাহলে সরোর জিভ কেটে রাস্তার কুকুরদের খেতে দেবেন আর সরোকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন।

সরো দমবার পাত্রী নয়। সে প্রথমে 'আহা—হা' বলে একটা বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গি করলো। মুখের সে ভঙ্গি দেখে কোন কাক চিল হার্টফেল করে মারা যায়নি কারণ আশে পাশে যে-সব কাক চিল ছিল তারা আগেই পালিয়েছে। তারপর মিত্তির বউকে কিছু জ্ঞানদান করলো। মিত্তির বউ কেন খোকার জন্মের অনেক আগের থেকেই সরো এ বাড়িতে আছে। তাকে এবাড়ি থেকে বের করে দেবে এ কথা বলার সাহস মিত্তির বউ-এর শাশুড়ীরও ছিল না। ছোটলোকের মেয়ের এত বড় দুঃসাহস যে সে এরকম কথা বলে। সরোর খোকা এলে সরো এ মুখপুড়ীকে তখনি দূর করে দেবে। অবশ্য খুকুমণিকে সে নিজের কাছে রেখে দেবে। মিত্তির বউকে সরো একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থ বংশে মিত্তিররা কুলীন। সুতরাং সরোর খোকার বউ-এর অভাব হবে না যেমন ধান ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

এটা হল সেদিনকার ঝগড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। পুরো বর্ণনা সাহিত্যে অচল। সে ভাষা এবং ভঙ্গি সাহিত্যে তুলে ধরার ক্ষমতাও সতু বক্সির নেই। আর

তুলে ধরলেও পড়ার রুচি সতু বক্সির পাঠকদের হবে না।

সেদিনকার ঝগড়া কিন্তু মিত্তির বাড়িতেই শেষ হয় না সতু বক্সির ডাক্তারখানা পর্যন্ত গড়ায়।

প্রথমে আসেন মিত্তির বউ। তিনি মিত্তির মশাই-এর আদরের ঝি-মায়ের কীর্তিকলাপ সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তারপরে সতু বক্সিকে অনুরোধ করেন মিত্তির মশাইকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে, এই ঝি যদি থাকে তাহলে খুকুর স্বাস্থ্য রক্ষা অসম্ভব। মিত্তির বউ না হয় পরের বাড়ির মেয়ে কিন্তু খুকু তো মিত্তির বাড়িরই মেয়ে—তার স্বাস্থ্য তো রক্ষা করা দরকার।

তা ছাড়া যাবার সময় মিত্তির বউ একটু খাটো গলায় একথাও বলে যান যে তিনি ঘোষের মেয়ে হতে পারেন কিন্তু এ কথা তিনি বোঝেন দু-সের আড়াই-সের দুধের যে হিসেব সরো দেয় সেটা আসলে আফিমখোর সরোর চুরি করে নিজের বরাদ্দ বাড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

সরোও ছাড়বার পাত্রী নয় সেও একসময় ডাক্তারখানায় আসে। সতু বক্সিকে সামনা সামনি তার জিজ্ঞাসা করে নেয়া দরকার। সরোর এই প্রায় সাড়ে তিন কুড়ি বয়স হল কিন্তু ডাক্তার দুধ খেতে বারণ করেছে এমন কথা সে কোনদিন শোনেনি তাছাড়া সরোর বউমাটির নজর মোটেই উঁচু নয়। ঘোষের মেয়ে তো, দুধে জল মেশানোই ওদের জাত ব্যবসা আর স্যাকরা যে রকম নিজের মায়ের সোনাও চুরি করে ঘোষেরাও সেরকম নিজের মেয়ের দুধ চুরি করতে কসুর করে না। আর এরকম ছোটনজর দৃষ্টিকৃপণ বউ সরো তার জীবনে দেখেনি।

যাবার সময় গলাটা একটু নীচু করে সরো ডাক্তারবাবুকে বউমার কার্পণ্যের আসল কারণটাও বলে যায়। মেয়েকে যদি আশ মিটিয়ে দুধ খাওয়ানো যায় তাহলে তার রঙবেরঙের শাড়ী গয়না হয় না। কালে কালে সরো কত কি দেখবে। নিজের মেয়ের দুধ কমিয়ে শাড়ী গয়না করা এও দেখতে হবে। অবিশ্যি এমন রূপের মুখে যে আগুন ছাড়া আর কিছু জোটা উচিত নয় তাও সরো বলে যায়।

ঝগড়াটা যে এবার একটু অসাধারণ হয়েছিল তা সতু বক্সি বুঝতে পারে শেষ পর্যন্ত যখন মিত্তির মশাই-এর আবির্ভাব হয়। রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা, ডাক্তারখানায় রুগীর সংখ্যা কমে এসেছে। পাখাটার ঠিক নীচে বসে বড়দা নিস্পৃহ ভাবে চুরুট টানছেন আর সতু বক্সি বসে বসে লেবুর জলের গ্লাসে

চুমুক দিচ্ছে। মিস্তির মশাই আসতে সতু বদ্যি ভিতরের ঘরে গিয়ে বসে, মিস্তির মশাইও সেই ঘরে গিয়ে বসেন।

মিস্তির মশাই-এর পক্ষে সতু বদ্যির সাহায্য ছাড়া এ জট ছাড়ানো এখন অসম্ভব। ঝগড়ার ব্যাপারটা তো সতু বদ্যি জানেই। এখন সতু বদ্যি যদি সরো আর মিস্তির বউকে বুঝিয়ে বলে খুকুর দুধের সম্বন্ধে তা হলেই এই ঝগড়ার হয়তো মিটমাট হতে পারে। সতু বদ্যি কি একবার যাবে মিস্তির বাড়ি ?

বড়দাকে বসতে বলে সতু বদ্যি মিস্তির বাড়ি রওনা হয়।

মিস্তির বাড়ি থেকে বক্তৃতা দিয়ে সতু বদ্যি যখন ফিরল তখনও বড়দা বসেই আছেন। চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বড়দা জিজ্ঞাসা করেন 'আবার কিসের মামলা ডাক্তার ?' পুরো গল্পটা সতু বদ্যি বলে বড়দাকে—সতু বদ্যি জাত বদ্যি হলেও এ ঝগড়া কি করে মেটাবে ? সতু বদ্যি কেন তার যে সব পূর্বপুরুষ পাথরের থামে চুল গজাতেন কিংবা কাটা শেয়ালের লেজ গজাতেন তাদের পক্ষেও এ ঝগড়া মেটানো অসম্ভব।

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বড়দা বললেন 'হুঁ, মেয়েমানুষ যদি ঝগড়াই না করবে তা হলে তো সে মেয়েমানুষ থাকবে না—মানুষ হয়ে যাবে।'

তারপরে দু-বছর কেটেছে—মিস্তির বাড়ির ঝগড়া তেমনি চলেছে। মিস্তির বউও আছে, মিস্তির মশাইও আছেন, সরো আছে আর খুকুও আছে। সতু বদ্যিও মাঝে মাঝে ঝগড়া মিটিয়ে চলেছে।

সেদিন আবার সরোর আবির্ভাব হয়। তার আর সে মূর্তি নেই কেমন যেন মিইয়ে গেছে। দেখেই সতু বদ্যি জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার। সরোর এমন মিইয়ে যাওয়া সত্যিই আশ্চর্য। সরো একটু বিষ চায়—সে মরবে। আর বিষ যদি সতু বদ্যি না দিতে পারে তবে অন্তত এমন একটা জায়গার খোঁজ দিক যেখানে বিনে পয়সায় কাউকে জ্বালাতন না করে সরো অনাহারে মরতে পারে।

কী ব্যাপার ? সতু বদ্যি প্রশ্ন করে।

কাল রাত্রি থেকে সরোর গলা দিয়ে রক্ত উঠছে। তার তো বয়স কম হল না। সরো জানে এ মন্দ অসুখ। কাশির সঙ্গে রক্ত—এ অসুখে আর রক্ষে নেই। আর শুধু সরোর নয় সরো যদি বাড়ি থেকে না পালায় তাহলে বাড়ির সবার এ অসুখ হবে। সরো নিজের বাপ-মাকে খেয়েছে, খোকাবাবু অর্থাৎ মিস্তির মশাই-এর বাপ-মাকে খেয়েছে আর কাউকে খাবার ইচ্ছা সরোর নেই।

তাইতে সরোর অনুরোধ : একটু বিষ, না হয় একটু শান্তিতে মরবার স্থান।

সতু বদ্যি সরোকে পরীক্ষা করে। রক্তের চাপ বড্ড বেশী হয়েছে—আড়াই-শোর ওপরে। বয়স সাড়ে তিনকুড়ি। জ্বর নেই। সুতরাং এ যক্ষ্মা রোগ নয়। রক্তের চাপবৃদ্ধি হওয়ার দরুন ফুসফুসের কোন শিরা ফেটে রক্তপাত হয়েছে। এর চিকিৎসা হল ঘুম, উপবাস, জোলাপ আর সর্পগন্ধা। তাছাড়া পঞ্চম একটি আছে সেটি হল মাথা ঠাণ্ডা রাখা। সরোর পক্ষে সেইটিই বোধ হয় সবচাইতে শক্ত।

বুড়ী খুব ভয় পেয়েছে। সতু বদ্যি বুড়ীকে বোঝায় তার কি হয়েছে কিন্তু বুড়ী বোঝে না। ঐ যে ঘোষের মেয়ে আছে বাড়িতে সে এমনিতেই দু-বেলা সরোর শ্রাদ্ধ করছে আর এরকম মন্দ অসুখ হলে সে কি আর সরোকে বাড়িতে থাকতে দেবে? তাছাড়া সরো অনেককে খেয়েছে আর কাউকে খাবার ইচ্ছা তার নেই।

হ্যাঁ, আর একটা কথা সরোর বলতে বাকী ছিল। সরোর গলায় একটা ষোল ভরির বিছে হার আছে আর বারো ভরির বালা আছে। বালা জোড়া সরো বউমাকেই দিয়ে যেতে চায়। শত হলেও তার খোকার বউ তো আর সরোর ইচ্ছে হারটা খুকুমণির বিয়েতে খুকুমণিকে দেয়। খুকুমণিকে যেন তখন বলা হয় তার একটা হতভাগী সরোদিদি ছিল সে দিয়ে গেছে।

সরোর কোন অনুরোধ সম্বন্ধেই সতু বদ্যি ভালো-মন্দ কিছু বলে না। শুধু সরোকে বলে ওবেলা আসতে। সরো বেরিয়ে যায়।

এখন সতু বদ্যির হল মুশকিল। মিত্তির মশাইকে ডাকতে হবে। ডেকে তার সঙ্গে সরো সম্বন্ধে কথা বলতে হবে। বলে একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

মিত্তির বাবু যখন এসে পৌঁছোন তখন সেই রাত সাড়ে আটটা। সেই বড়দা চুরুট খাচ্ছেন আর সতু বদ্যি লেবুর জল খাচ্ছে। খাস কামরায় বসে সতু বদ্যি আর মিত্তির মশাই-এ কথা হয়।

মিত্তির মশাই বেশ উত্তেজিত। তাঁর স্ত্রী জানতে পেরেছেন যে সরোর গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। সুতরাং মিত্তির মশাই প্রস্তাব করেছিলেন, যত টাকাই লাগুক সরোকে কোন হাসপাতাল কিংবা স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করে দেয়া হোক কিন্তু মিত্তির বউ তাতে ঘোর আপত্তি করেছে। সরোকে বাড়ি থেকে হাসপাতালে বিদেয় করলে নাকি পাড়াপড়শী থেকে শুরু করে আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতিগুষ্টি সবাই মিত্তির বউকেই দুষবে। বলবে শাশুড়ীর মত ঝি মা—বউটা

ক্যাট ক্যাট করে তাকে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় বার করে দিয়ে ছাড়লো ? তাও আবার অসুস্থ অবস্থায়। এই অপবাদ মিত্তির বউ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

মিত্তির বউ-এর ভাষণের টীকা করেছেন মিত্তির মশাই কিন্তু অন্যরকম। তাঁর ধারণা যে মিত্তির বউ-এর শত বিরক্তি সত্ত্বেও যেমন মিত্তির মশাই সরোকে মাথায় তুলে রেখেছেন তেমনি এখন মিত্তির বউ নিজেকে আর খুকুকে বিপদগ্রস্ত করে তার প্রতিশোধ নেবেন। তাইতে এখন মিত্তির মশাই-এর অনুরোধ সতু বদ্যি যদি সরোকে কোন হাসপাতালে ভর্তির বন্দোবস্ত করে দেন।

সতু বদ্যি সরোর অবস্থা বুঝিয়ে বলা শুরু করবে ঠিক এরকম সময় বাইরে মিত্তির বউ-এর গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। আওয়াজ শুনে মিত্তির মশাই যে পিছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করেন সে একটা দেখার জিনিস। সতু বদ্যির সব কাজই পণ্ড হয়। এদিকে একটু বাদেই সরো আসবে—বলে গেছে ওবেলা-আসবো। উঃ, মানুষ স্ত্রীকে এমন ভয় করে!

মিত্তির বউ ঘরে ঢুকে সোজাসুজি কথা পাড়েন। বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করতেই হবে। আজ যদি মিত্তির বউ-এর শাশুড়ী থাকতেন আর তাঁর যদি এরকম অসুখ করতো তাহলে কি মিত্তির-বউ তাকে ফেলে দিত? মিত্তির বাড়ির ছাদে একটা চিলেকোঠা আছে সেখানে সরোকে আলাদা করে রাখার সব বন্দোবস্ত মিত্তির বউ করবে। ডাক্তারবাবু কি সরোর চিকিৎসার-দায়িত্ব নেবেন না?

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। ঠিক এই সময়ই কিনা সরো ঢুকলো সতু বদ্যির ঘরে। সদ্য এক গেলাস লেবুজল খাওয়া সত্ত্বেও সতু বদ্যির গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কুরুক্ষেত্রটা যদি ডাক্তারখানায় শুরু হয় তাহলেই সতু বদ্যি গেছে। সকালে উঠে কার মুখ দেখেছিল সে—বদ্যি গিন্নীর না আর কারো।

আর সরোও তেমনি। এসেই শুরু করে, 'এই যে বউমা, আমাকে তাড়ানোর বন্দোবস্ত করতে এসেছ তো। আমাকে যে তুমি তাড়াবে সে সুখ তোমার কখনও হতে দেব না—আমি নিজে থেকেই চলে যাব।' সরো ভাঙবে তবু মচকাবে না।

তারপরে বারো ভরির দু-গাছা বালা মিত্তির বউ-এর হাতে দিয়ে সরো বলে,

'এই বালাজোড়া বাছা তুমিই পরো। তোমাকেই দিলাম। কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো ঐ-যে পাড়াকুঁদুলে সরো হতভাগী ছিল সে দিয়েছে।' তারপরে সত্যি সত্যি হারছড়াও সরো বউ-এর হাতেই তুলে দেয়। হারটাও খুকুকে বিয়ের সময়ে দিতে হবে তার হতভাগী সরোদিদির নামে।

এতক্ষণে সতু বদ্যি একটু সাহস সঞ্চয় করেছে। অল্প বিপদ হলে মানুষের হাত-পা পেটের ভিতরে সেঁদিয়ে যায় কিন্তু বেশী বিপদে মানুষের একটা মরিয়া হওয়ার সাহস আসে। সতু বদ্যির বোধ হয় তাই এসেছে। সরো আর মিস্তির বউ-এর ঝগড়ার চাইতে বড় বিপদ সতু বদ্যি ভাবতে পারে না।

তাইতে সতু বদ্যি বুঝিয়ে বলে আসলে সরোর রোগটা মন্দ রোগ নয়। ওরা সবাই অনর্থক ভয় পেয়েছে। সরো যেমন ছিল যেমনই থাকতে পারে। কারো ছোঁয়াচ লাগবে না। তাছাড়া সতু বদ্যি ব্যবস্থাপত্রও লিখে দেয়। ব্যবস্থাপত্র লেখা হলে সতু বদ্যি ভয়ে ভয়ে দুজনের দিকে তাকায়—সরো আর মিস্তির বউ। দেখে দুজনে ড্যাবা ড্যাবা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সরো একবার দেখছে মিস্তির বউকে আর একবার সতু বদ্যিকে। আর মিস্তির বউ একবার দেখেছ সরোর দিকে আর একবার দেখছে সতু বদ্যিকে।

সতু বদ্যির সামনে দিয়ে হাত ধরাধরি করে সরো আর মিস্তির বউ বেরিয়ে যায়। মিস্তির বউ সরোকে শক্ত করে ধরেছে সরো যদি পালিয়ে যায়। আর সরোও মিস্তির বউকে শক্ত করে ধরেছে। বোধ হয় ভয় পেয়েছে—যদি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

ওরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় পড়েছে তখন হঠাৎ সতু বদ্যির মনে হয় একটা উপদেশ দেয়া তো বাকী রয়ে গেল—সতু বদ্যি আবার পিছু ডাকে, 'সরো, ও সরো মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। ঝগড়াঝাঁটি একটু কম করতে হবে পারবে তো?'

দুজনেই প্রায় একসঙ্গেই কথা বলে। সরো বলে 'পারবো।' মিস্তির বউ বলে 'হ্যাঁ, পারবো।'

দুজনে ফিরে তাকায়। ওদের মুখে রাস্তার আলো পড়ে। সতু বদ্যি দেখতে পায় দুজনের চোখে চক্ চক্ করছে মুক্তোর মত জলের ফোঁটা।



ঢাকনা

আওয়াজ হচ্ছে ঘড়াৎ ঘড়্ ঘড়্‌ড়্‌ড়্—ঘড়াৎ ঘড়্‌ঘড়্‌ড়্‌ড়্। ঠিক এক তালের একটা আওয়াজ।

রাতদুপুরে যে কোন বাড়ি থেকেই এরকম আওয়াজ হতে পারে। তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই আওয়াজ শুনতেই সতু বদ্যিকে রাতদুপুরে ডেকে এনেছে।

বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সতু বদ্যি আওয়াজটা শোনে আর রোগীর দিকে তাকিয়ে থাকে। যে কোন সময়েই, বিশেষ করে রাত দুপুরে তো বটেই, প্রথম রুগী-বাড়ি গেলে আর সে রুগী-বাড়ি অপরিচিত হলে, —প্রথম দরকার সে বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সে জন্যে রোগ বুঝতে সতু বদ্যি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিছানার সামনে। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারার ভদ্রলোক। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা —ওজনও প্রায় আড়াই মন হবে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ না হলেও গৌরবর্ণ নিশ্চয়ই বলা যায়। সমাহিত শান্তিপূর্ণ মুখের ভাব, উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। জ্ঞান নেই বলেই মনে হয়; সাধারণ লোক ভাববে হয়তো সুখনিদ্রায় নিদ্রিত ভদ্রলোক। বয়স? তা প্রায় ষাট হবে। মাথার কাছে ভদ্রমহিলা বসে আছেন যিনি? হ্যাঁ, স্ত্রীই হবেন। বেশ সুপুষ্ট চেহারা—প্রায় আড়াই মন ওজন।

ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ঘুমুচ্ছিলেন পাশের ঘরে। স্ত্রী কলঘরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন ভদ্রলোক তাঁর বিছানায় শুয়ে গভীর ভাবে নাক ডাকছেন। ভদ্রমহিলা অনেক হাঁক ডাক করলেন, কিন্তু ভদ্রলোক কোন সাড়া দিলেন না, নাক ডাকছেন তো ডাকিয়েই চলেছেন। তখন ভদ্রমহিলার মনে হল এ তো ঠিক ঘুম নয়, বোধ হয় আর কিছু। বাড়িতে কেউ নেই। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, একটি বাচ্চা বউ আর কিছু ঝি চাকর ছিল। চাকরকেই ডাকলেন 'রামসিং!' যে সতু বদ্যিকে ডাকছে গিয়েছিল

সেই চাকর, ভদ্রলোকের অনেক পুরনো চাকর।

সতু বদ্যি রোগী পরীক্ষা করে, নিশ্বাসের গতি পরীক্ষা করে, নাড়ী পরীক্ষা করে। চোখের মণি পরীক্ষা করে, রক্তের চাপ পরীক্ষা করে। মাংসপেশীর স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করে, বিভিন্ন স্নায়ুর কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করে।

অসুখটা সন্ন্যাস অর্থাৎ কিনা মাথার ভিতরের রক্তবাহী শিরার ভিতর দিয়ে রক্তচলাচলের গতি ব্যাহত হয়েছে। এটা হতে পারে দুটো কারণে। হয়তো শিরার মাঝখানে কোন জায়গায় খানিকটা রক্ত জমে গিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে, কিংবা হয়তো কোন শিরা ফেটে গিয়ে ভিতরকার রক্ত শিরাপথে প্রবাহিত না হয়ে মস্তিষ্কের ভিতরে সাধারণ ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রথমটা যদি হয় তা হলে সারবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হলেও আছে কিন্তু দ্বিতীয়টা হলে কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে ঠিক কি যে হয়েছে এখুনি তা জানা সম্ভব নয়। জেনেও যে খুব বেশী লাভ হবে তাও নয় অবিশ্যি।

তবে রক্তের চাপ তিন-শরও ওপরে। কমিয়ে দিলে হয় না?

কিন্তু কমাবে কি দিয়ে?

নাকের কাছে এ্যামিল নাইট্রাইট ধরে? তাতে কমবে বটে তখুনি, কিন্তু একটু বাদেই আবার বেড়ে যাবে।

তা হলে? সর্পগন্ধা? কিন্তু তাতেও অনেক সময় লাগবে।

তাঁহলে?

রক্ত মোক্ষন করা যায়। শিরা থেকে খানিকটা রক্ত বার করে দিলে বেশ হয়। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত রক্তের চাপ কমে যাবে।

সুতরাং সতু বদ্যি লেগে যায় রক্ত মোক্ষন করতে। কিন্তু একা একা রক্ত মোক্ষন করা তো মুশকিল। সাহায্য করার কোন লোক চাই! রাত দুপুরে সে সাহায্য করে কে? এ-বাড়িটা এখন প্রমীলার রাজত্ব। পুরুষ মানুষ নেই। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে শেষ পর্যন্ত ওই রামসিংই এসে দাঁড়ায়। ওই যে রামসিং সতু বদ্যিকে ডাকতে গিয়েছিল—বাবুদের বহুকালের লোক। অনেকদিন সে এ বাড়িতে আছে।

সতু বদ্যি সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টেনে বার করে, রামসিং গামলা এগিয়ে দেয়। সতু বদ্যি সিরিঞ্জ এগিয়ে দেয়, রামসিং জল দিয়ে ধুয়ে দেয়।

আধঘণ্টা পরিশ্রমের পর প্রায় আড়াই পোয়া রক্ত মোক্ষন হয়। সতু বদ্যির

সর্বাঙ্গ চটচট করতে থাকে ঘামে আর রক্তে। রামসিং-এরও চেহারা রক্ত, ঘাম আর রোগীর বমিতে বীভৎস হয়ে গিয়েছে।

রামসিং ঘর পরিষ্কার করে। সতু বদ্যি বাথরুমে যায় হাত-মুখ ধুতে।

সতু বদ্যি বাথরুমে হাত ধোয় আর ভাবে ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে কিছু দিন আগে—কোথায় যেন পড়েছিল ; কিন্তু তার স্থান কাল কিছুতেই আর মনে করতে পারে না। কী রকম অদ্ভুত লাগে! খুব প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য নয় কিন্তু এই সামান্য কথাটা মনে করতে না পেরে নিজের ওপর সতু বদ্যি ক্রমশ বিরক্ত হয়ে ওঠে। তার স্মৃতির ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করে খোঁজে, আর হাত ধোয়। হাতের ময়লা ধোয় আর মগজ খোঁজে। নাঃ, মনে আর পড়ে না। সেদিনকার কুশীলবও এইরকমই। এইরকমই মোটা ভদ্রলোক, এই রকমই রামসিং-এর মত একজন লোক, এই রকমই একজন অসুস্থ রোগা—সতু বদ্যি নিজেই সেখানকার ডাক্তার। নাঃ, ভেবে আর পায় না। কত রোগ আর রুগীর তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে সে স্মৃতি, আর উঠবে না।

বাইরে বের হবার সময় দরজার কাছে রামসিং টাকাটা এগিয়ে দেয় আর হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা ধরে। খুব উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'বাবু বাঁচবে তো?'

সতু বদ্যি তাকায় রামসিংএর মুখের দিকে। রক্ত, ঘাম আর বমির কলঙ্ক এখনও ওর দেহ থেকে যায়নি। অর্ধজীর্ণ ক্ষীর আর মাংস রুগীর বমির সঙ্গে উঠে এসেছিল—তার তীব্র গন্ধ তখনও ওর সর্বাঙ্গে।

কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর মুখের প্রতি তন্তু দিয়ে যেন ফেটে বের হচ্ছে উৎকণ্ঠা। লোকটি জিজ্ঞাসা করে, 'বাবু বাঁচবে তো?'

বাড়ির দরজা আর রামসিংএর প্রশ্ন দুটো মিলে সতু বদ্যির স্মৃতির দরজা খুলে দেয়। হ্যাঁ, এ তো এক বছর আগের কথা। এই বাবু আর এই রামসিংই ছিল সেদিনকার পাত্রপাত্রী। সেদিনও ডাক্তার ছিল সতু বদ্যি। এমনি করেই দরজার কাছে সতু বদ্যিকে প্রশ্ন করেছিল—'রুগী বাঁচবে তো?'

তবে সে দরজাটা বস্তির। আর রুগী ছিল রামসিং নিজেই। বুড়ো মানুষ, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। নিউমোনিয়া হলে ভয়েরই কথা। আর রামসিংএর নিউমোনিয়াই হয়েছিল। সতু বদ্যিকে ডেকে দিয়ে রামসিংয়ের ছেলে দুটো বসে গেল বারান্দায়। আরও দুটো ছেলের সঙ্গে হাত ছড়িয়ে দিয়ে খেলতে শুরু করল। সতু বদ্যি নাড়ী গোনে আর বাইরে বারান্দা থেকে খেলার আওয়াজ শোনে :

আটকান চাটকান
দিয়া চটাকান
বরফুলে বরইলা ফুলে
শাওনমে করইলা ফুলে

আর নিশ্বাস গোনে। আর যখন স্টেথেস্কোপ দিয়ে ফুসফুসের অংশ পরীক্ষা করছে তখনও খেলা চলছেই, স্টেথেস্কোপের ঢাকনার ভিতর দিয়ে সতু বদ্যি আওয়াজ শোনে কড় কড় কড় কড়। চুল ঘষার মত আওয়াজ। আর শোনে বারান্দা থেকে আওয়াজ —

শাওন গইলি চোরি
বাসাওলি বাড়ি
ঠিক দুপহরিয়া
নবাব কাচহরিয়া.........

নিউমোনিয়া হয়েছে কিন্তু ভয়ের বিশেষ কিছু নেই। বয়সটা যেমন খারাপ তেমনি আজকাল পেনিসিলিনও আছে। তবে সতু বদ্যিকে সাহায্য করার একজন লোক দরকার। সে লোক কোথায়?

ইন্‌জেকশান দেবার সময় রুগীর হাতটা একটু জোর করে ধরতে হবে। লোকটা তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ইন্‌জেকশনের ছুঁচটি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা ওষুধটা ভিতরে যাবার সময়ে লোকটি যদি লাফিয়ে ওঠে আর ছুঁচটি ভেঙে যদি ভিতরে থেকে যায়?

এমন কি ইনজেকশান দেবার পর সিরিঞ্জ ধোয়ার জন্যে এক বাটি জলও এগিয়ে দেবার লোক নেই। কে এগিয়ে দেয়? বস্তিগুলি একেবারেই পাণ্ডব-বর্জিত। বিশ্ববিজয়ী পাণ্ডবরাই যেখানে এগোতে সাহস করে না সতু বদ্যি সেখানে কোন্ ছার?

তবে এই সময় বাইরে থেকে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ বহুয়াকে হুকুম জারি করে—ডাক্তার সাহেবকে সাহায্য করতে। ঘোমটা-টানা বহুয়া কম্পমান হাতে এগিয়ে আসে সতু বদ্যিকে সাহায্য করতে। চেষ্টা করলে কি হয়, এসব দেহাতী উজবুকগুলোর কাছ থেকে কাজ আদায় করা ভারি মুশ্‌কিল। এরা কি করতে হবে তা তো জানেই না—বললেও বোঝে না। বুঝবেই বা কি করে? এরা না বোঝে বাংলা, না বোঝে হিন্দী, না বোঝে ইংরেজি, না বোঝে উর্দু। সুতরাং এদের কোন্ ভাষায় কথা বলবে?

অথচ কথাও বলা দরকার। শুধু ইনজেকশান দিলেই তো রোগ সারে না। শুশ্রূষা পথ্য সবেরই প্রয়োজন। কিন্তু উপায়ই বা কি? তাইতে সতু বক্সি বাংলা আর মৈথিলি, ভোজপুরী আর বারানসী, হিন্দী আর উর্দু—হাতের ভঙ্গি আর মুখের ভঙ্গি সব মিলিয়ে বহুয়াকে বোঝায়—। ঘরের ভিতরে সতু বক্সির কথা আর বাইরে—

সালিমপুর ডাগা
মাধাউর সোর
হারনা হারনী লট্টকর থোর

সব মিশিয়ে বিচিত্র ঐক্যতান সৃষ্টি করে।

বাইরে আসতে এক ভদ্রলোক টাকা এগিয়ে দিলেন।

গৌরবর্ণ অভিজাত পুরুষ, কোঁচানো দিশি ধুতি আর নিষ্কলঙ্ক সাদা গিলে করা পাঞ্জাবীতে রুচি আর অর্থ দুই-ই প্রকাশ পায়।

অমায়িক ভদ্রলোক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন—'রুগী বাঁচবে তো?'

সতু বক্সি বুঝতে পারে এই লোকই বহুয়াকে হুকুম করেছিল একটু আগে।

আলগোছে ভদ্রলোক টাকা এগিয়ে দিয়েছিলেন সতু বক্সিকে।

সেই ভদ্রলোকই আজকের রুগী।

এতক্ষণে সতু বক্সির স্মৃতির ওপর থেকে ঢাকনাটা খুলেছে।

সতু বক্সি ঝিমোতে ঝিমোতে বাড়ি ফেরে। আর ভাবে—ঢাকনাটা আসলে কি? প্রায় একই রুগী আর অভিভাবক—ডাক্তার এক কিন্তু মনে পড়তে এত দেরি হয় কেন?

রুগী আর অভিভাবকের স্থান পরিবর্তন কি?

না।

তা হলে? বস্তি আর কোঠাবাড়ির গোলমাল?

না, তাও নয়।

তা হলে?

ঢাকনাটা আসলে খুব পাতলা—খুব হালকা।

আজকের অভিভাবকের ঘর্মাক্ত কলঙ্কিত মূর্তি ও তার প্রতি তন্ত্রীতে ফেটে-পড়া উৎকণ্ঠা। আর সেদিনকার নিষ্কলঙ্ক গিলেকরা সাংখ্যের দ্রষ্টা দার্শনিক অভিভাবক—

এই সামান্য তফাতই ঢাকনা হয়ে আটকে রেখেছিল সতু বক্সির স্মৃতিভাণ্ডার।



সতু বন্থি ও অপ্সরী

'সেই চেকটা কোথায় ?' কাগজপত্তর আর নোটগুলো পকেট থেকে বার করে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে বন্থিগিন্নী বলে।

'কোন্ চেক ?' সতু বন্থি পাল্টা প্রশ্ন করে। সতু বন্থি বুঝতে পারে বন্থি-গিন্নী কোন্ চেক খুঁজছে তাই অপ্রিয় উত্তরটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় অন্যমনস্ক ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করে বসে।

'কেন দাসেদের বাড়ির চেক ?' বন্থিগিন্নীর গলায় একটু বিরক্তি বেজে ওঠে। দাসেদের বাড়ি থেকে গত কয়েক বছর যাবৎ বন্থিগিন্নী মাসের গোড়ায় একটা করে চেক পেয়ে আসছে। সেটা কোন মাসে চার-শ হয়, কোন মাসে পাঁচশ ছয়-শ হয় কিন্তু তিন-শর নীচে কোন মাসে হয় না। দাসেদের বাড়ি থেকে সতু বন্থির এক মাসের মজুরি।

'সেই চেক আর পাবে না। কোনদিনও পাবে না।' সতু বন্থি মরিয়া হয়ে বলেই ফেলে। আর যাই হোক বন্থিগিন্নীর কাছে তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না।

'কেন কেন ?' এবার বন্থিগিন্নী রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

দাসেদের বাড়ির চেক মানে বাড়ি ভাড়া, তিন চাকরের মাইনে, গয়লার টাকা সব হয়েও আরও কিছু। তারপর সারা মাস সতু বন্থি খুচরো যা কিছু রোজগার করে তাতেই চলে যায় বরং কিছু উদ্‌বৃত্তই থাকে। সুতরাং দাসেদের চেক আর কোনও দিন না পাওয়া যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ তো হতেই পারে।

'একটা গল্প বলেছিলাম দাস কর্তাকে। তাঁর ছেলে আর আপিসের কেরানী সবার সামনে। তিনি আর ডাকবেন না। তাঁর তো মান ইজ্জত আছে আর কলকাতা শহরে ডাক্তারেরও অভাব নেই।' সতু বন্থি বন্থি-গিন্নীকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে।

দাসের কয়লার খনি আছে, শেয়ারের ব্যবসা আছে। কলকাতায় বাড়ি-ভাড়া-দেয়া ব্যবসা আছে এবং আরও অনেক কিছু আছে। তাদের মাসিক আয় হয়তো লাখের কোঠায় পৌঁছোয়। আর বিদ্যাবুদ্ধি স্কুলের গণ্ডি কোন পুরুষেই পেরোয়নি। সেই দাসেদের বাড়ি রোজই সতু বদ্যির ডাক পড়ে—একবার নয় একাধিকবার। রাত্তির বেলা দাস কর্তার ঘুমের আগে পা কনকন করলে সতু বদ্যির ডাক পড়ে। দাসগিন্নীর ঘুমটা ভালো না হলে সতু বদ্যির ডাক পড়ে। তাছাড়া ছেলেদের কান কটু কটু আছে, দাঁত কনকন আছে, মেয়েদের চুলের খুশকি আছে আর আছে দাস কর্তার যৌবনকে ধরে রাখবার প্রচেষ্টায় সতু বদ্যির সাহায্য।

এর জন্যে সতু বদ্যি যতবার দাসের বাড়ি যাবে ততবার তার মজুরি খাতায় লেখা হবে। মাসের পয়লা তারিখে দাস বাবুর দারোয়ান এসে সেলাম বাজিয়ে সতু বদ্যিকে চেক দিয়ে যায়। গত কয়েক বছরে এ-নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু সতু বদ্যি ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। দাস কর্তা মানুষ চরিয়ে খান। তাঁর কয়লার খনির মালকাটা কুলি থেকে শুরু করে কলকাতার বাড়ির দারোয়ান পর্যন্ত অনেক রকম মানুষ। তাইতে তিনি জানেন যে সতু বদ্যির মত পাড়ার একজন সামান্য ডাক্তারের কাছে তাঁর মাসিক চেকের মূল্য কত। তা তিনি জানুন তাতে সতু বদ্যির আপত্তি নেই। তাই বলে কি সে ধারণা তাকে বার বারই সতু বদ্যির কাছে জাহির করতে হবে। আর শুধু তিনি কেন তাঁর পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই ধারণা জাহির করে। এমনকি তাঁর বাড়ির দারোয়ান, সরকার, তারাও জাহির করে।

পাঁচজন রুগীর বাড়ি থেকে যদি একসঙ্গে সতু বদ্যির সময় দাবি করে তাহলে সতু বদ্যির নীতি হল—যার প্রয়োজন বেশী তার বাড়িতেই সতু বদ্যি আগে যাবে অর্থাৎ কিনা সতু বদ্যির কার্যক্রম ঠিক হবে রুগীর প্রয়োজনানুক্রমে কিন্তু দাস কর্তাদের ধারণা সতু বদ্যির কার্যক্রম ঠিক হবে মক্কেলের বাড়ির প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণানুক্রমে।

দাসবাবুদের অনেক রকম ধারণা আছে তার ভিতরে এটাও একটি। দাস-বাবুদের ধনের মত তাদের ধারণা সম্বন্ধেও সতু বদ্যির বিশেষ কোন ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু না থাকলেই বা ছাড়ছে কে? তাঁর ধারণা কর্তা নানাভাবে জানাতে কসুর করেন না। আর শুধু তিনি নন তাঁর বাড়ির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা

সবাই দেখা যাচ্ছে লোককে জ্ঞানদানে বিশেষ পটু—এমন কি বাড়ির ড্রাইভার চাকর পর্যন্ত।

দাস কর্তা অর্থের বিনিময়ে সতু বদ্যির কর্মক্ষমতা ক্রয় করেন বলে তাঁর প্রয়োজন হলে অন্য সবার প্রয়োজন ফেলে সতু বদ্যি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হবে এ আশা তিনি করেন এবং এ আশা যে তিনি করেন তা সতু বদ্যিকে জানাতেও কার্পণ্য করেন না।

ইদানীং গরমটা বেশ পড়েছে, তার ফলে সতু বদ্যির কাজের চাপও বেড়েছে। তাইতে সব সময় দাস কর্তা ডাকলেই সতু বদ্যি গিয়ে হাজির হতে পারছিল না। সে-কারণে দাস কর্তা মাঝে মাঝে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। যেমন প্রকাশ করেন তাঁর কয়লা খনির কর্মচারীদের সম্বন্ধে।

দাস কর্তার এক বন্ধু কিছুদিন আগে ব্যবসার খাতিরে ইওরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি আসবার সময় কিছু কাগজপত্র নিয়ে এসে দাসবাবুকে উপহার হিসাবে দান করে গেছেন। মেদবৃদ্ধি হলে মানুষের যৌবন এবং যুবকোচিত ক্ষমতা হ্রাস পায়। অথচ ভালো খাদ্য কিংবা মদ্য সবেই মেদবৃদ্ধির সম্ভাবনা। ইওরোপে নাকি ওই অতিরিক্ত মেদ হ্রাসের নানারকম উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সে সম্বন্ধেই কিছু কাগজপত্র দাস কর্তার বন্ধু আসবার সময়ে নিয়ে এসেছিলেন আর দাস কর্তা মেদবাহুল্যের জন্যে কষ্ট পাচ্ছেন বলে বন্ধুটি সেই কাগজপত্র দাসবাবুকে উপহার স্বরূপ দিয়ে গেছেন। দাসবাবুর অনেক কাজ—ব্যবসা, হিসাব, রাজনীতি, ক্লাব, সংসার ইত্যাদি। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার—সেটা অবিশ্যি সাধারণ্যে প্রকাশ্য নয়—ইংরেজি ভাষা দাসবাবু তেমন ভালো বোঝেন না। সেই জন্যে এই কাগজপত্রগুলো দাসবাবু আগের দিন সতু বদ্যির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওদের মতানুসারে দাসবাবুর মেদহ্রাসের জন্যে কি করা দরকার সেই মোদ্দা কথাটা সতু বদ্যিকে পরদিন সকাল দশটার সময়ে বলে যেতে হবে।

কিন্তু সকাল দশটায় সতু বদ্যির ডাক্তারখানায় অসংখ্য রুগী। তাই সে যেতে পারেনি।

দাস কর্তার দারোয়ান পরম বিনীত ভাবে সতু বদ্যিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে দাস কর্তার কাছে সকাল দশটায় যাবার কথা ছিল। তাছাড়া সতু বদ্যির কল্যাণের জন্যেই রুগীদের সামনে একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে যে, দাস-কর্তা গোঁসা করতে পারেন আর গোঁসা হলে দাস কর্তা কেরানী আর

অফিসার কাউকেই খাতির করেন না।

এই দারোয়ানই সতু বদ্যিকে মাসে মাসে চেক্ পৌঁছে দিয়ে যায়। চেকের সঙ্গে প্রতি মাসে একটা লম্বা সেলামও করে যায়।

এ জাতীয় ব্যবহার সতু বদ্যি অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করে আসছে কিন্তু সেদিন কেন যেন হঠাৎ সতু বদ্যির মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। খদ্দের লক্ষ্মী হওয়া সত্ত্বেও।

বলতে বলতে সতু বদ্যি উত্তেজিত হয়ে বদ্যিগিন্নীকে বলে—স্বর্গের অপ্সরা রম্ভাবতী স্বর্গীয়া হলেও বারাঙ্গনা অর্থাৎ দেহব্যবসায়ী গণিকা কিন্তু স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনে সব চাইতে ক্ষমতাশালী রাজা রাবণ যখন তাকে হরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপরে বলাৎকার করেছিল তখন রম্ভাবতী বারাঙ্গনা হলেও প্রতিশোধ নিতে কসুর করেনি।

আর সতু বদ্যি এত বড় একজন ডাকসাইটে ডাক্তার হয়ে কিনা বিনা প্রতিবাদে দাস কর্তার অত্যাচার মেনে নেবে? তাইতে সেদিন সতু বদ্যি অত্যাচারের মৃদু প্রতিবাদ করেছিল আর তার ফলে দাস কর্তাদের বাড়িতে তারপরে আর সতু বদ্যির ডাক পড়েনি।

সে প্রতিবাদ হল এই রকম :

সতু বদ্যি দাস কর্তার বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছে। বৈঠকখানায় দাস কর্তা আছেন, কর্মচারী-কেরানীরা রয়েছেন, মোসাহেবরা রয়েছেন, দাস কর্তার ছেলে আছেন, সতু বদ্যিও রয়েছে। নানা কথা হল বিশেষ করে মেদরোধ সম্বন্ধে। দাস কর্তা তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কোন রুগীর মেদ সত্যি সত্যি কমে গিয়েছে এরকম শুনেছেন?'

এ প্রশ্নের সুযোগ নিতে সতু বদ্যি ইতস্তত করেনি। সতু বদ্যি বলে, হ্যাঁ একটি কেসের কথা সে শুনেছে। দাস কর্তার যদি সময় থাকে তাহলে সতু বদ্যি ঘটনাটা বিশদ ভাবে বলতে পারে। দাস কর্তা রাজী হন। তাইতে সতু বদ্যি বিশদ ভাবে রসিয়ে গল্পটি বলেছে।

বদ্যিগিন্নী জিজ্ঞেস করে 'কী এমন গল্প যাতে তোমার চাকরি গেল?'

সতু বদ্যি বদ্যিগিন্নীর কাছে গল্পটা আবার বলে—

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার রাজ্যও যেমন বিরাট তার ধনদৌলতেরও তেমনি অভাব নেই। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, মোটরশালে মোটর, এরোপ্লেনশালে এরোপ্লেন গম গম করছে।

রাজার সংসারেও অভাব নেই। একটি মাত্র রাজপুত্তুর—তার যেমন রূপ তেমনি গুণ। রাজ্যের লোক বলে যেন ময়ূরছাড়া কার্তিক। ময়ূর নাই বা রইল। রাজপুত্তুরের হাতী আছে, ঘোড়া আছে, মোটর আছে, এরোপ্লেন আছে—তারা ময়ূরের চাইতে কম কিসে? ক্রমে রাজপুত্তুরের বয়স হল। একুশ বছর যখন পেরুলো তখন রাজা বললেন, ছেলের বিয়ে দেব। রাজপুত্তুরের বিয়ে, যে-সে মেয়ে হলে তো আর হবে না। যেমন ময়ূরছাড়া কার্তিক বর তেমন চাই ডানাকাটা পরী কনে।

দশদিকে দশ রকম দূত ছুটলো—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। কেউ গেল মোটরে, কেউ গেল জাহাজে, কেউ গেল হেঁটে, কেউ গেল ঊর্ধ্বে উড়ো-জাহাজে, কেউ গেল জলের নীচে সাব-মেরিনে। কিন্তু না, পছন্দসই মেয়ে আর মেলে না।

কোন মেয়ে যদি ফর্সা হয় তো দেখা গেল বেঁটে। আবার ফর্সা লম্বা যদি হয় তো দেখা গেল মোটা। আবার যদি ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী হয় তো দেখা গেল নাক-চোখ সুন্দর নয়। তা হলে তো চলবে না—রাজামশাই বলেছেন ডানাকাটা পরী চাই। আর ডানাটি যে কাটা হয়েছে তার কাটা দাগটি তিনি দেখে নেবেন। তাছাড়াও যে কোন পরীর ডানা কাটলেই চলবে না। বেশ শিক্ষিত মানে লেখা-পড়া জানে, গাইতে জানে, নাচতে জানে, রাঁধতে জানে—এমন সর্বাঙ্গ সুন্দরী আর সর্বগুণান্বিতা কনে চাই।

রাজামশাই কনে আর খুঁজে পান না। এমনিতেই মন খারাপ, এর ভিতরে আবার শুরু হল নগরে এক গোলমাল। গোলমাল মানে যুদ্ধ। পাশের রাজ্যের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ। দেখতে দেখতে স্কুল, কলেজ, কোর্ট, কাছারী সব বন্ধ হয়ে গেল—খালি যুদ্ধ আর যুদ্ধ করে দিন কাটতে লাগলো।

চাষা ভূষো, কুলি, মাস্টার, মজুর, কেরানী, এদের যে সব ছেলে মেয়ে তারা তো সব বন্দুক কাঁধে করে যুদ্ধে চলে গেল। কিন্তু যারা সত্যিকারের বনেদী ঘরের ছেলে মেয়ে তারা তো আর বন্দুক কাঁধে করে যুদ্ধে যেতে পারে না তাইতে মন্ত্রীপুত্তুর, কোটালপুত্তুর, সদাগরপুত্তুর এরা সব বাড়িতেই বসে রইল।

চারদিকে যুদ্ধের ডামাডোল। এর ভিতরে একদিন রাজার দূত এসে খবর দিলেন যে রাজধানীর সদাগরের এক মেয়ে আছে—তার যেমনি রূপ তেমনি গুণ। রাজপুত্তুরের সঙ্গে মানাবে যেন লক্ষ্মীতে আর নারায়ণে।

রাজপুত্তুর অমনি ছুটলেন মোটর চড়ে। সঙ্গে ছুটলো দাস-দাসী, সিপাই শান্ত্রী ইত্যাদি। কিন্তু রাজপুত্তুর ফিরে এল—মুখটি যেন বাংলার পাঁচ। রাজা শুধালেন 'কী হল?'

'ওটা কি একটা মেয়ে'—রাজপুত্তুর মুখ বেঁকিয়ে বললো 'ওটা তো একটা ফুটবল। আর শুধু ও কেন রাজধানীর যত সদাগর, মন্ত্রী, কোটাল সবার মেয়ে জড়ো হয়েছিল ও বাড়িতে—সব কটা ফুটবল হয়ে গেছে।'

রাজা ভেবেছিলেন ঘরে যদি লক্ষ্মী আসে তাহলে গৃহলক্ষ্মীর পিছনে পিছনে হয়তো জয়লক্ষ্মীও আসবে। কিন্তু রাজার মনের সাধ পূর্ণ হল না, মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। এর ভিতরে গোদের ওপরে বিষ ফোড়ার মত একদিন মন্ত্রী এসে বললেন 'রাজামশাই রাজামশাই যুদ্ধু যে হবে তেল কোথায়?' রাজা বললেন 'যুদ্ধু কি মাছ ভাজা যে তেল লাগবে?' মন্ত্রী মশাই পরম বিনীত ভাবে বললেন 'মাছ ভাজা না হলেও মকাই ভাজাও নয়। তেল ছাড়া যুদ্ধু এক পাও এগুবে না।' রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি থেকে শুরু করে বন্দুক, কামান, এরোপ্লেন, মোটর সর্বত্র তেলের প্রয়োজন।

শুনে রাজা বললেন, 'তাইতো আচ্ছা কলুসর্দারকে ডাকো, তার ঘানিতে নিশ্চয়ই তেল আছে।'

কলুসর্দার এলেন—হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন কিন্তু এসে গলায় কাপড় দিয়ে হাত জোড় করে পরম বিনীত ভাবে বললেন 'হুজুর তেল যা ছিল তা মন্ত্রী মশাইদের পায়ে দিতেই ফুরিয়ে গেছে আর তো নেই।'

রাজা বললেন 'ডাকো তাহলে বদ্যিকে তার কাছে নিশ্চয়ই রেড়ির তেল আছে।' বগলে পুঁথি, গলায় চাদর, হতে নস্যির টিপ নিয়ে বদ্যি মশাই হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন কিন্তু সব শুনে একটিপ নস্যি নিয়ে পরম যত্নে নাকটি মুছে বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন 'রাজামশাই তেল ছিল—রেড়ির তেল অনেক ছিল কিন্তু রাজধানীর সদাগরদের এমনি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছে যে তারাই সব তেল খেয়ে বসে আছে।'

মহাসমস্যা! তেল পাওয়া যায় কোথায়? রাজা রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন: যে তেলের সমস্যা সমাধান করতে পারবে সে যা পুরস্কার চায় তাই পাবে। কিন্তু কেউ আর সমাধান করতে পারে না।

রাজার কারাগারে ছিল এক বন্দী—যুদ্ধের সময় রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। সে একদিন খবর পাঠালো যে তেলের

খবর সে বলতে পারে যদি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করা হয়। রাজা বললেন, 'বেশ নিয়ে এস তাকে-রাজসভায়।'

বন্দী এসে বললো, 'হুজুর ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো?'

রাজা বললেন 'নির্ভয়ে বলো।'

তখন বন্দী বললো 'রাজামশাই মন্ত্রী সেনাপতি থেকে শুরু করে রাজধানীর কোটাল সদাগর সবারই যুদ্ধের ভিতর বেশ তেল বেড়েছে। শুধু তারা কেন তাদের ছেলে-মেয়ে জ্ঞাতি-গুষ্টি সবারই তেল বেড়েছে। একটি পেষণ যন্ত্রে (হাইড্রলিক প্রেসে) তাদের ঢুকিয়ে দিন অনেক তেল বেরুবে।'

যেই কথা সেই কাজ। সব ধরে ধরে হাইড্রলিক প্রেসে ঢোকানো হল। আর সে কী তেল, তেলে রাজ্যি ভেসে গেল, যুদ্ধে তো জয় হলই। বন্দীও মুক্তি পেল। প্রাণদণ্ড তো হলই না বরং অনেক পুরস্কার নিয়ে সে তার বাড়ি ফিরে গেল।

আর শুধু কি তাই পেষণ যন্ত্রে আরও কাজ হল। সেই যে সদাগরের মেয়ে যাকে দেখে রাজপুত্তুর বলেছিলেন ফুটবল—পেষণ যন্ত্রে পড়ে তার সব তেল বেরিয়ে গেল। ছিলেন ফুটবল হয়ে গেলেন তন্বী। রাজপুত্তুরেরও পছন্দ হয়ে গেল—ব্যাস বিয়ে হয়ে গেল। তখন রাজা, রানী, ছেলে, বউ সবাই মিলে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগলো।

তেল বেরুনোর গল্প শুনে প্রথমে হাসলেন কেরানীবাবুরা, তারপরে হাসলেন দাস কর্তা নিজে, তারপরে হাসলেন তাঁর মোসাহেবেরা। সতু বদ্যি নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

কিন্তু তারপর থেকে দাস কর্তাদের বাড়িতে আর সতু বদ্যির ডাক পড়েনি।

গল্প শুনে বদ্যিগিন্নী বললে, 'রম্ভাবতীর আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়েছিলে কিন্তু তোমাতে আর রম্ভাবতীতে সামান্য একটু তফাৎ আছে। রম্ভাবতী হলেন অপ্সরী—তিনি খান হয়তো একটু চাঁদের আলো নয় তো একটু দক্ষিণের বাতাস। তাতে পয়সা লাগে না আর তুমি যা খাবে তাইতেই পয়সা লাগবে।'